‘স্টেট অব চাইল্ড রাইটস্ ইন বাংলাদেশ ২০১১’

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম
ঢাকা, বাংলাদেশ

ওয়ালেদ মাহমুদ
কন্সালটেন্ট
নলেজ ডিসকোভারী
(কন্সালটেন্ট সার্ভিস ও রির্সোস সেন্টার)
ই-মেইল: waledmahmud@yahoo.com

স্টেট অব চাইল্ড রাইটস্ ইন বাংলাদেশ ২০১১

সেপ্টেম্বর ২০১২

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম
ঢাকা, বাংলাদেশ

ওয়ালেদ মাহমুদ

নির্বাহী পরিচালক, নলেজ ডিসকভারী

ই-মেইল: waledmahmud@yahoo.com,

knowledgedis@gmail.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ৫
রূপকল্প ৫
কল্পধারা ৫
বাংলাদেশে শিশু শ্রম সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য ৮
ভূমিকা ৮
শিশু শ্রমে নিয়োজিতদের অবস্থা ৮
আইনগত দিক ৯
পথ শিশু ১১
ভূমিকা ১১
বাসস্থান পরিস্থিতি ১২
পথ শিশুদের অবস্থান ১৩
পথ শিশুদের সমস্যা ১৪
স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা ১৫
পথ-শিশুদের জন্য নগরভিত্তিক স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ ১৬
পরিশেষ ১৭
কেস স্টাডি # ১ ..... ১৯
জন্ম নিবন্ধন: শিশু অথিকার রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ ২০
ভূমিকা ২০
অনলাইন জন্ম নিবন্ধন ২১
সরকারী ওয়েবসাইট: জন্ম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ২২
জন্ম নিবন্ধন কভারেজ ২২
আইনী বাধ্যবাধকতা এবং শাস্তির বিধান ২৩
জন্ম নিবন্ধনের বর্তমান ফি (চাঁদা)সমূহ ২৩
পরিশেষ ২৪
শিশুদের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ নির্যাতন ২৫
ভূমিকা ২৫
গৃহ পরিচালিকার কাজে যুক্ত হওয়ার কারণসমূহ ২৬
কর্মরত বাড়ীর পরিস্থিতি ২৬
শিশুদের যৌন নির্যাতন ২৭
গৃহ পরিচালিকার কাজে নিযুক্তদের দৃষ্টিভঙ্গী ২৮
কেস স্টাডি # ২ ..... ২৯
বাংলাদেশে শিশু পাচার পরিস্থিতি ৩০
ভূমিকা ৩০
আইনগত নীতিমালা ৩১
শিশু পাচারের গমনপথ ৩১
পাচারের ঘটনা সংগঠনের কারণসমূহ ৩১
সমস্যা: সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ৩২
উদ্ধার ও পুনর্বাসনের দূবলর্তাসমূহ ৩৩
প্রাথমিক শিক্ষা কভারেজ ৩৫
ভূমিকা ৩৫
শিক্ষা সম্পর্কিত শ্রম-শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গী ৩৬
শিশুদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ৩৭
ভূমিকা ৩৭

টেবিল

টেবিল ০.১: শিশু শ্রম সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ৯
টেবিল ০.২: জেলাসমূহের নাম: অনলাইন জন্ম নিবন্ধন ১৯
টেবিল ০.৩: বছরভিত্তিক জন্ম নিবন্ধন কভারেজ ২০
টেবিল ০.৪: জন্ম নিবন্ধনের বর্তমান ফি (চাঁদা) ২২
টেবিল ০.৫: প্রাথমিক শিক্ষার অর্জন ৩৩
টেবিল ০.৬: উন্নততর মাতৃ স্বাস্থ্য অবস্থা ৩৭

চিত্র

চিত্র ০.১: জন্ম নিবন্ধন এবং সার্টিফিকেট ২১
চিত্র ০.২: পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার, ১৯৯৩-২০১০, বাংলাদেশ (প্রতি হাজারে) ৩৩

ভূমিকা

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) ২৬৩টি বাংলাদেশী এনজিও-দের একটি এপেক্স পরিষদ যারা শিশু অধিকার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এই ফোরামের প্রতিনিধিরা শিশু অধিকার বাস্তবায়ন এবং তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে সকলের দৃষ্টি আর্কষণের জন্য বিভিন্নভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশু অধিকার কনভেনশন অনুসরণে বিএসএএফ ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি শিশু অধিকার বিষয়টিতে সকলকে উদ্বুদ্ধ এবং শিশু অধিকার রক্ষা করতে জাতীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে নেটওয়ার্ক তৈরী ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে এবং বিভিন্ন রকম সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইউএন এজেন্সীসমূহ, আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপনে কাজ করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি নেটওয়ার্ক আরো শক্তিশালী ও উন্নততর করতে, কার্যকর এডভোকেসী পদ্ধতি নির্ধারণে, একটি শিশু অধিকার সম্পর্কিত তথ্যসম্ভার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে এবং শিশু অধিকার বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করতে কাজ করে যাচ্ছে।

শিশু বান্ধব বিশ্ব সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে বিএসএএফ সার্বক্ষণিক এডভোকেসী করছে। শিশু অধিকার নিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করছে তাদেরকে একত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বিএসএএফ উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা প্রদান করছে। বিএসএএফ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে এবং মানবসম্পদ বাড়ানো ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রবাহ সরবরাহ ও উন্মুক্ত করে শিশু অধিকার কার্যক্রমকে একটি সম্মানজনক আসনে নিয়ে আসতে সকলকে সহায়তা করছে। বিএসএএফ এক্ষেত্রে সম্মিলিত নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নিজেরা সরাসরি কোন রকম সেবা প্রদানমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত না হয়ে শিশু সম্পর্কিত বিরাজমান নীতিসমূহ ও জাতীয় পর্যায়ের আইন-কানুনসমূহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে বিএসএএফ আইনপ্রণেতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সাথে একযোগে কাজ করে। সিআরসি সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বদঃপ্রণোদিতভাবে প্রচার কার্য পরিচালনা করতে এবং অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে কার্যকরভাবে তুলে ধরতে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিনিয়ত কাজ করে আসছে। বিএসএএফ সাধারণ জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে সার্বিক সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

রূপকল্প

বাংলাদেশের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য নির্যাতন মুক্ত, শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সুস্থ ও উন্নততর শিশু অধিকার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

কল্পধারা

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে সরাসরি ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সুপারিশ করে:

- বাংলাদেশে শিশুদের নিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করছে তাদেরকে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা
- শিশু নির্যাতন ও শোষণ বন্ধ করা
- শিশু শ্রম বন্ধ করা
- শিশু পাচার বন্ধ করা
- বৈষম্যহীনভাবে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা

- জেন্ডার বৈষম্য দূর করা
- শিশুদের জন্য বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা
- উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- সামাজিক নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা
- দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা
- মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীসহ শিশুদের জন্য কুসংস্কারমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও বিস্ড়ার ঘটানো

লক্ষ্য

শিশু অধিকার সম্পর্কিত ইউএন কনভেনশন বিষয়ে সকলকে জাগ্রত করাই বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্যসমূহ

- সিআরসি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা
- শিশু অধিকার বিষয়ে সর্বস্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করা
- শিশু অধিকার নিশ্চিত করতে আইনগত অবকাঠামো তৈরীতে সহায়তা করা
- মৌলিক অধিকার ভোগ করার সুবিধা বৃদ্ধি করা
- অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু শ্রম বন্ধ করা
- শিশু নীতি বাস্তবায়ন করা

প্রকাশনা প্রাসঙ্গিকতা

'স্টেট অব চাইল্ড রাইটস্ ইন বাংলাদেশ ২০১১' বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের একটি নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা। বাংলাদেশে শিশুদের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভের জন্য বিএসএএফ বিভিন্ন উৎস থেকে নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়ে থাকে। বিভিন্ন রকম প্রকাশনা, সংবাদপত্র, ইলেক্ট্রনিক ও ইলেকট্রিক্যাল মিডিয়া, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্যান্য বস্তুনিষ্ঠ উৎস থেকে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া, বিএসএএফ-এর নিজস্ব তথ্য সংগ্রহ সেন্টার রয়েছে, যা এ প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় লেখনী তৈরী করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অধিকন্তু, এই প্রকাশনাটি বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দলে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও বিশেষজ্ঞদের সাথে মত বিনিময় পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, সুনির্দিষ্ট কেস-স্টাডি প্রকাশনায় সংযুক্ত করা হয়েছে। এ সকল বিষয়ের সাথে উন্মুক্ত তথ্যসমূহের সংযোজনের বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রকাশিত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা

এই বার্ষিক প্রকাশনা তৈরী করার জন্য সম্ভাব্য সকল রিসোর্স সেন্টার ও তাদের প্রকাশনাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথমে সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এই তালিকায় সকল প্রকার সরকারী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিভিন্ন স্তরের এনজিওসমূহ এবং প্রাইভেট সেক্টরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান থেকে শিশু অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া, সকল প্রকার প্রকাশিত গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন, বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ এই প্রকাশনার আওতায় বিবেচনা করা হয়।

গুণগত ও পরিমানগত মূল্যায়ন

গুণগত ও পরিমানগত তথ্য সংযুক্তি করা এই প্রকাশনার একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। শিশুদের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন রকম বিষয়ে সারা বছর শিশুদের অবস্থা কি রকম ছিল সে সম্পর্কে ধারণা ও তার প্রভাব বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের সহজলভ্যতা ছিল একটি প্রধান বাঁধা বা সীমাবদ্ধতা। অনেক সময় ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও যোগাযোগের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রকম তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে শিশু অধিকার বিষয়ক তথ্য-ভান্ডার সংরক্ষণ করা হলে এ ধরণের অসুবিধা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে। তবে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন দলে আলোচনায় শিশু অধিকার বিষয়ক গুণগত ও পরিমানগত দুটো দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিষয়ভিত্তিক দলীয় আলোচনা

এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক দলীয় আলোচনার বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মোট তিনটি বিষয়ভিত্তিক দলীয় আলোচনা বাংলাদেশের তিনটি প্রধান বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল আলোচনা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের পেশার সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের মধ্যে সরকারী কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, স্থানীয় পর্যায়ে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং সুবিধা-বঞ্চিত শিশুরা উল্লেখযোগ্য। এই সকল আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকাশনার বিভিন্ন প্রবন্ধে সংযোজিত করা হয়। বিষয়ভিত্তিক দলীয় আলোচনা রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম শহরে অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী ও খুলনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা শিশু অধিকার সম্পর্কিত নানা বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করেন। অন্যদিকে সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের সাথে তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে জানার জন্য চট্টগ্রাম শহরে দলীয় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মূখ্য তথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ শিশু অধিকার বাস্তবায়ন কর্মকান্ডের সাথে জরিত। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বাইরে বিভিন্ন দাতাসংস্থা, আইএনজিও, এনজিও এবং সিবিওসমূহ শিশু অধিকার সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং শিশুদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে কাজ করে যাচ্ছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে শিশু অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে শিশুদের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর একটি নির্দেশিকা তৈরী করা হয়।

বাংলাদেশে শিশু শ্রম সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি ঘন জনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র; বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৮০ লক্ষের অধিক যেখানে ৩৪.৩% নাগরিকের বয়স ১৮ বছরের নিচে (প্রায় চার কোটি ৫০ লক্ষ)। অন্যদিকে প্রায় ৩১.৫% দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে (এইচআইইএস, ২০১০)[১]। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সক্ষমতার সাথে শিশু শ্রম বিষয়টি সম্পর্ক যুক্ত। সামাজিক অনুশীলন, অর্থনৈতিক সামর্থ্যহীনতা ও বাস্তবতার সাথে দেশব্যাপী বিস্তৃত পরিসরে শিশু শ্রমের সম্পর্ক রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুরা পরিবারে উল্লেখযোগ্য পরিমানে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা দিয়ে থাকে। সে কারণে দরিদ্র পরিবারের জন্য তাদের শিশুদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা অত্যাবশ্যক বা অতি মূল্যবান বিষয় হিসাবে দেখা হয়। মূলত পরিবারের বাবা-মা উভয়ই শিশুদেরকে বিভিন্ন রকম অর্থ উপার্জনকারী কাজকর্মে নিয়োজিত হতে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে শিশুদের শিক্ষা, অবসর ও বিনোদনে তাদের অধিকার ও আগ্রহের বিষয়টি তারা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে। ফলে অধিকাংশ শিশুরা ইচ্ছার বিপরীতে অর্থ উপার্জকারী যেকোন রকম কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। কম ঝুঁকিপূর্ণ থেকে শুরু করে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে নিজেদের জড়াতে তারা কার্পণ্য করে না। সাধারণত শিশুরা পাঁচ (৫) বছর বয়স থেকে শিশু শ্রমের সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সাথে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। এটি সার্বজনীন এবং সারা বিশ্বের চিত্রটি একই রকম। বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এদেশে সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে বিভিন্ন রকম সামাজিক ইস্যুতে পরিস্থিতির উন্নতি ও রক্ষা করার জন্য বেশী বিনিয়োগের প্রয়োজন। শিশুদের অবস্থার উন্নতির জন্য শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা বা শিশু শ্রম থেকে শিশুদের সরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে তরান্বিত করা গেলে সেটি সাধারণ মানুষের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করবে; ফলে কমিউনিটি পর্যায়ে শিশু অধিকার বাস্তবায়ন এবং তারজন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা অনেক সহজ হবে। সত্যিকার অর্থে শিশু অধিকার বাস্তবায়নে সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নের সাথে এই ধারণার সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন গবেষণায় এর সত্যতা পাওয়া গেছে।[২]

শিশু শ্রমে নিয়োজিতদের অবস্থা

নিয়মিতভাবে শিশু শ্রমের সাথে যুক্ত শিশুদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণের কোন রকম উদ্যোগ লক্ষ্যণীয় নয় যা একটি বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা। ফলে শিশুরা কোন ধরণের কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছে, কখন এবং কি কারণে একটি কাজ থেকে অন্য কাজে স্থানান্তরিত হচ্ছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন হয়ে যায়। তবে বিভিন্ন ধরণের জরীপে জানা যায় যে, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৭৪ লক্ষ শিশু বিভিন্ন রকম শিশু শ্রমের সাথে যুক্ত আছে, যাদের বয়স ৫-১৭ বছর। ৫-১৪ বছরের শিশুরা সবচেয়ে বেশী শিশু শ্রমের সাথে যুক্ত রয়েছে; ধারণা করা হয় প্রায় ৪৭ লক্ষ শ্রম-শিশু এই বয়স সীমার মধ্যে রয়েছে। এই শিশুদের মধ্যে একটি বড় অংশ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। শহরাঞ্চলের বস্তি এলাকাগুলোতে শ্রম-শিশুদের অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। মূলত নগরকেন্দ্রিক এলাকায় শিশু-শ্রমের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। ফলে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের একটি বিশাল অংশ শিশু-শ্রমের সাথে

[1] Bangladesh census 2011, Bangladesh Bureau of Statistics (BSS), July 2011
[2] Progress in Child well-being: building on what works, Safe the children, 2012

নিজেদের যুক্ত করে। বিভিন্ন এলাকার নগরাঞ্চলগুলোতে উপজাতীয় শিশুদেরও অর্থ উপার্জনকারী কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে দেখা যায়। সকলক্ষেত্রেই মূল কারণসমূহ একই রকম।

টেবিল ০.১: শিশু শ্রম সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

কর্মরত শিশু, বয়স ৫-১৭			৭৪ লক্ষ
কর্মরত শিশু, বয়স ৫-১৪			৪৭ লক্ষ
শ্রম-শিশু (সার্বজনীন সংজ্ঞা অনুযায়ী), বয়স ৫-১৭			৩২ লক্ষ
ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শ্রম-শিশু, বয়স ৫-১৭			১৩ লক্ষ
গৃহকাজে নিয়োজিত শ্রম-শিশু[3]			৪ লক্ষ ২১ হাজার
কর্মরত শিশুদের % হিসাব, বয়স ৫-১৪ (২০০৬)[4]	জাতীয়	বস্তি	উপ-জাতি
	১২.৮	১৯.১	১৭.৬

রাজশাহী বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি বিভাগীয় শহর; এখানে অনুষ্ঠিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় জানা যায় যে, রাজশাহীর শহরাঞ্চলে শ্রম-শিশুর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। নগরায়নের অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্যের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। রাজশাহীতে জনবসতি ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে; আশেপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে জনগণ এই নগরে ধাবিত হওয়ায় এই অঞ্চলের কর্ম ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে। উপরন্তু, এখানে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ রয়েছে যা অধিক জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করার প্রধান কারণ। আর সেইজন্যই রাজশাহী অঞ্চলে স্বল্প মজুরীর অদক্ষ শ্রমিকের বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রম-শিশুরা সেই চাহিদা পূরণ করছে। তবে, দৃশ্যত শিশুদের বিভিন্ন রকম অর্থ উপার্জনকারী পেশার সাথে যুক্ত না হতে উৎসাহিত করার জন্য উলেণ্টখযোগ্য কোন রকম সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগ দেখা যায় না। অবশ্য, বর্তমানে একটি সরকারী প্রকল্পের আওতায় শিশুদের কারিগরী শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে এবং একইসাথে মাসিক ভিত্তিতে কিছু ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে যা শিশুদের শ্রম বিক্রি করা থেকে দূরে রাখছে যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও শ্রম-শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য।

আইনগত দিক

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশ সরকার শিশু অধিকার বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। শিশুদের স্বার্থ রক্ষায় আন্তর্জাতিক ইস্যুতে সরকার একযোগে কাজ করছে। গত চার (৪) দশকে বাংলাদেশ সরকার শিশু অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম নীতি তৈরী করেছে এবং নিয়মিতভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী তা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে প্রধান নীতিসমূহ হলো: শিশু নীতি ১৯৭৪, জাতীয় শিশু নীতি ১৯৯৪ (সংশোধিত ২০১০) এবং শিশুদের জন্য কার্য পদ্ধতি পরিকল্পনা (একশন পণ্যান) ২০০৫-২০১২। উপরন্তু, বাংলাদেশ সরকার শিশুদের স্বার্থ রক্ষায় এবং শিশু অধিকার বিষয়ে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্যান্য সকল নীতিসমূহ অনুসরণ করে। বাংলাদেশ সরকার শিশু অধিকার সম্পর্কিত ইউএন কনভেনশন এবং আইএলও -এর প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন রকম কনভেনশনসমূহ মূল পতিপাদ্য নীতি হিসাবে অনুরসণ করে।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ বাংলাদেশে অত্যন্ত জরুরী ও অত্যাবশ্যক হিসাবে শিশু শ্রম রহিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার আত্মিক প্রয়োজনীয়তা ও তাড়না বোধ করেছে। একই সাথে বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘমেয়াদী ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের এডভোকেসী কাজে উলেণ্টখযোগ্য অবদার রাখার জন্য একটি নীতি প্রণয়ন করেছে যা জাতীয় শিশু

[3] International Labour Organization (ILO), Baseline Survey on Child Domestic Labour in Bangladesh, 2006
[4] BBS/ UNICEF, Multiple Indicator Cluster Survey 2006, October 2007

শ্রম রহিতকরণ নীতি ২০১০ নামে পরিচিত।[৫] এই রাষ্ট্রিয় নীতি প্রণয়নে সরকারের রাজনৈতিক সৎ ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ ও অনৈতিক কাজসহ সকল প্রকার শিশু শ্রম থেকে সরিয়ে এনে তাদের জীবনে অর্থময় পরিবর্তন আনয়ন করা। এই প্রনীত নীতির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে শিশুদের পিতামাতার জন্য অর্থ উপার্জন করার সুযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করা, পড়াশুনার জন্য শ্রম-শিশুদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা, শিশু শ্রম রহিত করতে আইনের সঠিক ব্যবহার ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।[৬]

[5] Official translation of national Child Labour Elimination Policy 2010
[6] Child Labour in Bangladesh, UNICEF, June 2010

পথ শিশু

ভূমিকা

বাংলাদেশ আয়তনের তুলনায় অধিক জনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে মানুষের আগমনের হার এখানে অত্যন্ত বেশী এবং এই স্থানান্তরের দ্রুতগতিতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। গ্রাম ছেড়ে শহরাঞ্চলে ধাবিত হওয়ার প্রধান কারণগুলো হচ্ছে বৈষম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অপর্যাপ্ততা। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মূলত অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে অনিয়ন্ত্রিতভাবে এগিয়ে চলেছে। সে কারণেই এ শহরে জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করে এবং তারা প্রতি নিয়ত জীবন যুদ্ধে নিয়োজিত থাকে। আর্থিক অসামর্থ্যের কারণে এই অংশের জনগণ বস্তি এলাকায় বসবাস করে। ফলে নাগরিক সমাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুরা বিভিন্ন কারণে অনেক বেশী অনিরাপদ।

পথ শিশু বিষয়টিকে ইউনিসেফ ব্যাপক পরিসরে সংজ্ঞায়িত করেছে। সংজ্ঞা অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সের ছেলে বা মেয়ে যারা নিরাপদহীন এবং কারো তত্ত্বাবধান ছাড়া রাস্তার উপর বসবাস করে বা রাস্তাই যাদের বাড়ী-ঘর এবং উপার্জনের মাধ্যম, তাদেরকে পথ-শিশু নামে আখ্যায়িত করা হবে। বর্ণিত সংজ্ঞায় পথ-শিশুদের পরিস্থিতি সহজেই অনুমেয়; সে কারণে এই সকল পথ-শিশুর সাথে যুক্ত যাবতীয় বিষয়সমূহকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত।

সাধারনভাবে বাংলাদেশে শিশুরা বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। পথ-শিশুদের সামগ্রিক অবস্থা আরো বেশী ভয়াবহ এবং তাদের জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো অনেক বেশী জটিল। একটি বিশাল অংশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী শহরাঞ্চলে বস্তি এলাকায় বসবাস করে যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন এবং তারা দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। ঢাকা শহরে এই সকল জনগণের বসবাস করার জন্য নিজেদের কোন জমি নেই; তারা বেআইনীভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে সরকারী জমি দখলে নিয়ে বসবাস করে অথবা ব্যক্তিগতভাবে অন্যের জায়গায় ভাড়া নিয়ে থাকে। এই সকল বস্তি এলাকার প্রায় ৫০% শিশু, যাদের বয়স পাঁচ (৫) বছরের নিচে। তারা যে কোন রকমের সুবিধা ও সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে শহরাঞ্চলগুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু অর্থ উপার্জন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। ঢাকা শহরে শ্রম-শিশুর পরিমাণ সর্বাধিক এবং বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। বাংলাদেশ ইনিষ্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস্ -এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে আনুমানিক প্রায় ৩৮০,০০০ শ্রম-শিশু রয়েছে এবং তার প্রায় ৫৫% ঢাকা শহরে বাস করে।[৭] বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (বিডিআরসি) -এর ২০১২ সালে পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফলে জানা গেছে যে, বাংলাদেশে পাঁচ থেকে ২০ লক্ষ পথ-শিশু

[7] UN Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention : Convention on the Rights of the Child : concluding observations : Bangladesh, 26 June 2009, CRC/C/BGD/CO/4, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8e977d0.html

রয়েছে।[৮] পরিসংখ্যানের মধ্যকার বিশাল ব্যবধান হওয়ার প্রধান কারণগুলো হচ্ছে শ্রম-শিশু সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা ও জন্ম নিবন্ধন না করার প্রবণতা। তবে শহরাঞ্চলে যে শ্রম-শিশুর সংখ্যা প্রতি নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে সে সম্পর্কে উল্লেখিত তথ্য থেকে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায়। এই পরিস্থিতি উদ্বেগজনক এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি উন্নয়নে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া উচিত। তবে যে বিষয়টিতে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন তাহলো এই অবস্থার সাথে দারিদ্রতা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

দ্রুত নগরায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সহায়ক চাহিদা পূরণে শিশু শ্রমের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শহরগুলো অপরিকল্পিতভাবে বাড়ছে। যদিও রাজধানী ঢাকা শহরের উন্নয়ন কর্মকান্ড একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণে হওয়ার জন্য মাস্টার প্ল্যান রয়েছে, তবে সেটিও পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। উপরন্তু, যেহেতু বাংলাদেশে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পূর্ণভাবে ঢাকাকেন্দ্রিক, ফলে ঢাকা শহরে জনসংখ্যার চাপ ক্রমাগত ও দ্রুততার ভিত্তিতে বেড়েই চলেছে। কাজেই ধারণা করা হয় যে, দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শহর ভিত্তিক হওয়ার জন্য শ্রম-শিশুর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, শহরাঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সাথে শিশু-শ্রমের বিষয়টি সর্ম্পক যুক্ত। ২০১০ সালের জরীপের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে মোট জনগণের শতকরা ২৮ ভাগ বসবাস করে এবং শহরাঞ্চলে মানুষ ধাবিত হওয়ার বার্ষিক শতকরা হার ৩.১ ভাগ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো রোডম্যাপ ২০১০-২০১৫)। কাজেই সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় আগামী দিনগুলোতে পথ-শিশুর সংখ্যা কমিয়ে আনা হবে সত্যিকার অর্থে একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ।

বাসস্থান পরিস্থিতি

বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থায় পথ-শিশুরা চূড়ান্ড় অবহেলা ও সুবিধাবঞ্চিত অবস্থার মধ্যে বসবাস করে, বেড়ে উঠে এবং অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন প্রকার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। সাধারণত শিশুরা পাইকারী ও খুচরা দোকানে, গাড়ী পরিষ্কার করার কাজে, সংবাদপত্র বিক্রি, ভিক্ষাবৃত্তি, বিভিন্ন যানবাহন মেরামতের দোকানে সহযোগী, রিকসা মেরামতের দোকান, পুনঃবিক্রয়শীল বর্জ্য সংগ্রহ এবং অন্যান্য বিভিন্ন রকমের কাজ করে। এসকল শ্রমের মধ্যে অনেক ধরণের শ্রম রয়েছে যেগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা শিশুদের শারীরিক ও মানুষিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠ-স্বাভাবিক বিকাশের অন্তরায় বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিশু অধিকার সম্পর্কিত ইউএন কমিটি ২০০৯ সালে বাংলাদেশে শিশুদের সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এই কমিটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বাংলাদেশে শ্রম-শিশুদের একটি বৃহৎ অংশ পাঁচ (৫) ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িত। এগুলো হচ্ছে ঝালাইয়ের কাজ (ওয়েলডিং), অটো ওয়ার্কশপ, পাবলিক যানবাহন, ব্যাটারী রিচার্জ এবং টোবাকো ফ্যাক্টরী। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কৌশল নামক নীতি সংক্রান্ত দলিলে শিশুদের জন্য মোট ৩৮ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রকাশ করে, যার মধ্যে উপরে উল্লেখিত পাঁচটি কাজের নামও রয়েছে। এই নীতি/পলিসি

[8] http://www.bangladeshstudies.org/child_facts.html

প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বাংলাদেশে প্রায় ৭৪ লক্ষ শ্রম-শিশু রয়েছে যারা নানা রকম অর্থ উপার্জনকারী পেশার সাথে যুক্ত এবং এদের বয়স ৫-১৭ বছরের মধ্যে। এই বিশাল পরিমাণ শ্রম-শিশুদের প্রায় ১৩ লক্ষ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া প্রায় এক লক্ষ ২৩ হাজার শিশু রিকশাচালক হিসাবে, এক লক্ষ ৫৩ হাজার শিশু বিভিন্ন ধরণের চায়ের দোকান ও রেস্টুরেন্টে এবং ৫৬ হাজার শিশু কাঠের কাজের জোগালী হিসাবে কর্মরত আছে।[৯]

পথ শিশুদের অবস্থান

সাধারনত পথ-শিশুদের বিভিন্ন রকম পাইকারী ও খুচরা তরিতরকারীর বাজারে, বাণিজ্যিক এলাকায়, বাস টার্মিনালে, হোটেল ও পার্কে, স্টেডিয়াম, রেল ষ্টেশন এবং প্রধান প্রধান সড়কে যত্রতত্র দেখা যায়। এই সকল এলাকায় সবসময় অত্যধিক মানুষের সমাগম লক্ষ্য করা যায়। পথ-শিশুরা শহরাঞ্চলে অর্থনৈতিকভাবে সবচাইতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। অন্যদিকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত স্বার্থান্বেষী মহল, গডফাদার বা মাস্তানরা এইসব পথ-শিশুদের ব্যবহার করে। ফলে পথ-শিশুরা অনৈতিক ও অপরাধমূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে পরে। তবে এ সম্পর্কিত কোন রকম পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নাই। মূলত পথ-শিশুদের কোন পরিচয় নেই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পথ-শিশুদের সাথে তাদের পিতা-মাতাদের কোন রকম যোগাযোগ নেই। তবে পিতামাতার সাথে যোগাযোগ না থাকার বহুবিধ কারণ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক টানাপোঁড়েনই মূল কারণ। পথ-শিশুরা সামাজিক ও অবস্থানগতভাবে খুবই নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে; এমনকি তারা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীদের কাজ থেকেও কোন রকম সহায়তা পায় না। পথ-শিশুদের সত্যিকার অর্থেই থাকার কোন বাড়ী-ঘর থাকে না, ফলে রাতের বেলা তারা এখানে-সেখানে সময় কাটায়। অনেক সময় স্বল্পকালীন সময়ের জন্য কোন জায়গা খালি পেলে সেখানেই রাত্রিযাপন করে। ফলে পথ-শিশুদের জীবন ব্যবস্থা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ। সরকারের দায়িত্বহীন ও অবহেলাপূর্ণ আচরণ পথ-শিশুদের জীবন আরো বেশী দূর্বিষহ করেছে। নিজেদের রক্ষা করার মত পথ-শিশুদের কোন রকম সামর্থ্য নেই এবং তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে একেবারেই অবগত নয়; তাদের আত্ম রক্ষার কৌশল জানা নেই। ফলে তারা সকল অর্থেই খুবই অসহায় জীবনযাপন করে।

বর্তমানে কিছু এনজিও বিভিন্নভাবে পথ-শিশুদের নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষা করতে কাজ করে যাচ্ছে। যদিও জাতীয় শিক্ষা নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের জন্য শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করা হয়েছে, তবুও বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণত মুষ্টিমেয় কিছু পথ-শিশুদের পড়াশুনা করতে দেখা যায়; মূলত ঐসব পথ-শিশুরা মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে না যেয়ে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে পড়াশুনা করার চেষ্টা করে। অপর দিকে এক জরীপে দেখা গেছে, ১০ লক্ষ পথ-শিশু কখনই কোন রকম শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক পথ-শিশুরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শ্রম-শিশু

[9] ILO and BBS, Baseline Survey for Determining Hazardous Child Labour Sectors in Bangladesh, 2005.

হিসাবে কাজ করার জন্য সময় বের করতে পারে না, ফলে পড়াশুনা করা সম্ভব হয় না। সাধারণভাবে, এদেশে পথ-শিশুরা 'টোকাই' নামে পরিচিত। তাদেরকে খুচরা জিনিষ বিক্রি, বিভিন্ন কাজে এবং অনৈতিক ও বেআইনী কাজের সাথে যুক্ত হতেও দেখা যায়। একজন পথ-শিশুর প্রতিদিনের গড় আয় হচ্ছে ৪০.৭০ টাকা (১ ইউএসডি = ৭৪ টাকা)।[১০]

পথ শিশুদের সমস্যা

নগরায়নের সাথে পথ-শিশু প্রসঙ্গের সরাসরি সংযোগ রয়েছে। পথ শিশু হচ্ছে শহরাঞ্চলের বাস্তবতা। বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব গভর্মেন্ট স্টাডিস এক গবেষণায় নগরায়নের সাথে শিশুদের বিভিন্ন রকম সমস্যার বহুমাত্রিক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, শহরাঞ্চলে পথ-শিশুর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার পেছনে প্রভাবশালী প্রভাবক কাজ করে; যেমন: ঢাকা শহর, বাংলাদেশের রাজধানী। এখানে পথ-শিশু হওয়ার পেছনে একটি বড় কারণ হচ্ছে তারা পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যাজ্য হয়েছে। গ্রামে দারিদ্রতার সাথে বসবাসের ফলে পরিবারে সকলের মধ্যে আত্মিক বন্ধন এমনিতেই হ্রাস পায়, তারপর নগর সভ্যতার কঠিন বাস্তবতায় তা ছিন্ন হয়ে পরে। অন্যান্য কারণসমূহের মধ্যে পিতামাতার দায়িত্বহীনতা, সংসার ভেঙ্গে যাওয়া, নগরাঞ্চলে আসার ফলে স্থানচ্যুতি ও বিভিন্ন রকম বিপর্যয় ইত্যাদি।

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার ছোট-বড় প্রতিটি শহরেই পথ-শিশু দেখা যায়। এদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু যে গৃহহীন এবং তারা যে রাস্তায় ছিন্নমূল হিসাবে বাস করে, এটি তারই সাক্ষ্য বহন করে। শুধু রাজধানী ঢাকাতেই অনেক বেশী সংখ্যক পথ-শিশু দেখা যায়; এই শিশুরা বাংলাদেশের সমগ্র পথ-শিশুর শতকরা ৫৫ ভাগ। বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিসের একটি গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, আনুমানিক ৩,৮০,০০০ পথ-শিশু শহরাঞ্চলের এদিক-সেদিক ঘুঁড়ে বেড়ায়।[১১] দেশের সকল ছোট-বড় শহরগুলোকে বিবেচনা করলে এই সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে; এক্ষেত্রে মোট পথ-শিশুর সংখ্যা আনুমানিক ৬,০০,০০০ -এর মত হতে পারে।[১২] পথ-শিশুদের মোট আনুমানিক সংখ্যাটি গবেষণা পদ্ধতির উপর নির্ধারণ করা হয়। ফলে বিভিন্ন গবেষণার কৌশল ও পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গবেষণার ফলাফলে পার্থক্য থাকতে পারে, তবে একটি বিষয় সর্বজন স্বীকৃত যে, পথ-শিশুর সংখ্যা প্রতি নিয়ত বেড়েই চলেছে। পথ-শিশুদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার কার্য কারণ খুঁজে দেখা প্রয়োজন। আগেই উল্লেখ করা হযেছে যে, পথ-শিশুরা বিভিন্ন রকম কাজের মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত করে,

[10] Consortium for street children: http://cfsc.trunky.net/content.asp?pageID=29&regionID=10&countryID=108
Uddin Md J, Koehlmoos TL, Ashraf A, Khan AI, Saha NC, Hossain M, 2009. Health needs and health-care-seeking behaviour of street-dwellers in Dhaka, Bangladesh. Health Policy and Planning;24:385-394

[11] UN Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention : Convention on the Rights of the Child : concluding observations : Bangladesh, 26 June 2009, CRC/C/BGD/CO/4, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8e977d0.html

[12] Uddin Md J, Koehlmoos TL, Ashraf A, Khan AI, Saha NC, Hossain M, 2008. Health needs and health-care-seeking behaviour of street-dwellers in Dhaka, Bangladesh. ICDDR,B. Dhaka. [Last accessed 17 August 2011]

যার অনেকগুলোই আইন বহির্ভূত কাজ বা অনৈতিক কার্যক্রম। এ ধরণের প্রধান কিছু কাজের উদাহরণ নিচে উলেণ্ঢখ করা হলো:

- যৌন সংক্রান্ত ট্রাফিকিং
- সংঘবদ্ধ অপরাধ
- নেশা ও তৎসংক্রান্ত কাজ

সাধারণত পথ-শিশুরা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল, বেআইনী কাজের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দুষ্টচক্র দ্বারা শোষিত হয়। এই সঙ্গবদ্ধ দলগুলো পথ-শিশুদের দিয়ে বিভিন্ন রকম বেআইনী কাজ করায় এবং করতে বাধ্য করে। সেই সকল পথ-শিশুরা যদি একবার অনৈতিক পথে পা দেয়, তাহলে তাদের আর সেই পথ থেকে সঠিক নৈতিকতাপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনে ফেরা হয় না বা তা অসম্ভব হয়ে যায়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে উঠে আসে, তাহলো, পথ-শিশুরা সরকারী, বেসরকারী ও অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রচন্ডভাবে নিগৃহীত ও অবহেলার শিকার হয়। পথ-শিশুদের জীবন সম্পর্কে কোন রকম আশা বা স্বপ্ন না থাকায় তারা কোনটি সঠিক আর কোনটি সঠিক নয় তা বিচার করার ক্ষমতা রাখে না। পথ-শিশুদের বিভিন্ন রকমের আইন বহির্ভূত কাজের সাথে জড়িয়ে যাওয়া তারই একটি প্রধান কারণ। তবে অন্যদিকে দেখা যায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থারাও পথ-শিশুদের নানাভাবে শোষণ করে, এমনকি যৌন নির্যাতনের মত কাজেও তারা লিপ্ত হয়।

স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা

বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পথ-শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত এবং নাই বললেই চলে। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত দূর্বল। তবে কিছু এনজিও এক্ষেত্রে অনিয়মিতভাবে কিছু প্রকল্পের আওতায় পথ-শিশুদের সাধারন মানের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে। সাধারণত দেখা যায় যে, পথ-শিশুরা যক্ষ্মা, পোলিও এবং ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়; তাছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় বিভিন্ন রকম রোগেও পথ-শিশুদের আক্রান্ত হতে দেখা যায়। যেমন, জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও হৃদরোগ (Podymow et al, and; NIPORT, 2009)। মেরী স্টোপস্ ক্লিনিক সোসাইটি নামে একটি আইএনজিও ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় মোট সাতটি (৭) কেন্দ্রের মাধ্যমে পথ-শিশুদের সাধারণ মানের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে। মেরী স্টোপসের এই উদ্যোগ অন্যান্যদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এই আইএনজিও-এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে সকল অঞ্চলের পথ-শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত বিরাজমান পরিস্থিতির বাস্তব ভিত্তিক সমাধানের জন্য অন্যান্য এনজিও, আইএনজিও এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন সাহায্যকারী সংস্থা) কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, গড়ে শতকরা ৪১ ভাগ পথ-শিশু অসুস্থ অবস্থায় কোন রকম স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে না বা স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির জন্য এরূপ ক্লিনিকের খোঁজ করে না

(Uddin et al, 2009)। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান সম্পর্কে পথ-শিশুদের ধারণা না থাকা একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

একই গবেষণার আরো দেখা গেছে যে, নগরকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সেবা অবকাঠামোতে পথ-শিশুদের জন্য সেবা প্রদানের কোন রকম ব্যবস্থা নেই। পথ-শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট নীতিমালা ও কৌশল না থাকা হচ্ছে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা, এরজন্য পথ-শিশুরা বিভিন্ন ধরণের রোগে আক্রান্ত হলেও কোন রকম চিকিৎসা পায় না। যেহেতু উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পথ-শিশু সারাদেশের বিভিন্ন শহরে ভ্রাম্যমান অবস্থায় থাকে, তাই বিষয়টি সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত।

আরেক সরকারী গবেষণার ফলাফল থেকে সরকারীভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে আনুমানিক ১৮ লক্ষ পথ শিশু রয়েছে যারা রাস্তা-ঘাটে এখানে সেখানে বসবাস করে। শুধু ঢাকা শহরে আনুমানিক প্রায় দুই লক্ষ ১৫ হাজার পথ-শিশু রয়েছে, যার মধ্যে মেয়ে পথ-শিশুর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। পথ শিশুদের অধিকাংশ অর্থ উপার্জনের জন্য পাইকারী ও খুচরা মুদি দোকানে, গাড়ী পরিষ্কার করার কাজে, সংবাদপত্র বিক্রয়, ভিক্ষাবৃত্তি, বিভিন্ন রকম গাড়ী মেরামতের দোকানে সহযোগি, বর্জ্য থেকে পুনঃবিক্রয়যোগ্য জিনিষ সংগ্রাহক এবং অন্যান্য অস্বীকৃত পেশার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে। অনেক পথ-শিশু মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথেও জড়িত।
তবে শহরাঞ্চলে পথ-শিশুর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। নগরাঞ্চলে প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৭-৯%। এই বিশাল জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে শহরের দিকে সকলের ধাবিত হওয়া, দারিদ্রতা, গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের সম্ভাবনা না থাকা, বেকারত্ব, ভূমিহীনতা, নদী ভাঙ্গন, পারিবারিক বিরোধ, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, একান্নবর্তী পরিবারের ধারণা ভেঙ্গে যাওয়া এবং সর্বোপরি সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ইত্যাদি।

পথ-শিশুদের জন্য নগরভিত্তিক স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ

নগর এলাকাসমূহে বিভিন্ন রকম গবেষণার ফলাফলে সাধারণভাবে দেখা গেছে যে, অসুস্থ হয়ে পরলে তারজন্য পরামর্শ গ্রহণ করতে এবং ঔষধপত্রের প্রয়োজন হলে কোথায় গেলে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যাবে তা অধিকাংশ পথ-শিশুরা জানে না (Uddin et al, 2009)। অবশ্য পথ-শিশুদের একটি বিশাল অংশ অসুস্থ হলেও কোন রকম স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। সাধারণত তারা নিকটবর্তী ঔষুধের দোকানে কম্পাউন্ডারের সাথে তাদের অসুস্থ্যতা ও রোগের বিষয় নিয়ে পরামর্শ করে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, পুরুষ পথ-শিশুরা মনে করে যে, অধিকাংশ অসুখের জন্য কোন রকম ডাক্তারী পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। অন্যান্যরা সচেতনভাবে স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যায়; এরকম আচরণের কারণ হতে পারে ভয় ও ভীরুতা এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকা। অধিকন্তু, পথ-শিশুরা সাধারণত কখনোই পাবলিক হাসপাতালগুলো বা বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা সেবা নেয়ার বিষয়টি অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার

কারণে চিন্তাই করে না। প্রাইভেট হাসপাতাল বা ক্লিনিকে গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের বিষয়টি একই কারণে তারা এড়িয়ে চলে। এটি দরিদ্র পথ-শিশুদের জন্য একটি বিশাল বাঁধা এবং সমস্যাও বটে। এক্ষেত্রে পথ-শিশুদের সমস্যা সমাধানকল্পে তাদের পক্ষে কাজ করার মত উল্লেখযোগ্য কোন এনজিও বা প্রতিষ্ঠান নেই। মেরী স্টোপস এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম যারা সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে পথ-শিশুদের যথাসম্ভব স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার প্রয়াস নিয়েছে। এক গবেষণার ফলাফলে পথ-শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং প্রাসঙ্গিক আরো কিছু বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। সেখানে বলা হয়, পথ-শিশুদের জন্য কি ধরণের স্বাস্থ্য সেবা কোন পর্যায়ে প্রয়োজন সে সম্পর্কে ধারণা নেয়ার পাশাপাশি অন্যান্য মৌলিক সুযোগ সুবিধা যেমন: প্রাথমিক শিক্ষা ও অর্থসহ অন্যান্য সহযোগিতা ও সেবা কিভাবে প্রদান করা যায়, সে সম্পর্কে করণীয় ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করা অত্যন্ড় জরুরী; একই সাথে সেই সকল সুবিধা যেন পথ-শিশুরা সহজেই গ্রহণ করতে পারে তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক (Ashford et al, 2006)। সাধারণ অর্থে একমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া এদেশে পথ-শিশুদের জন্য নিদেনপক্ষে সীমিত আকারে হলেও কোন রকম আনুষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেই। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে, নগর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কাঠামোতে পথ-শিশুদের অন্ততপক্ষে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার মত কোন রকম সুনির্দিষ্ট সরকারী নির্দেশনা ও নীতিমালা নেই। পথ-শিশুদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা প্রদান করার জন্য বিভিন্ন সিটি করপোরেশন, বিভিন্ন রকম সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এনজিওদের অনুসরন করার মত সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই এবং একই সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির জন্য ঐসকল স্থানে পথ-শিশুদের প্রবেশাধিকারের কোন রকম সুবিধা নেই (Uddin et al, 2009)।

পরিশেষ

পথ-শিশুদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে। তবে, পথ-শিশুদের অবস্থা উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান করা। একটি বিষয় সর্বজন স্বীকৃত, তাহলো, পথ-শিশুদের সমস্যা সমাধানে প্রকৃত উদ্যোগ না নেয়ার ফলে ক্রমাগত পথ-শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই বিষয়টির সাথে দারিদ্রতার সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। পথ-শিশুদের ভয়াবহতা থেকে বেড়িয়ে আসতে তাদের জন্য বাস্ড়বভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ড় জরুরী। এক্ষেত্রে সরকারকে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে সরকারকে সহায়তা করার জন্য অবশ্যই অন্যান্য সহায়ক সংস্থাসমূহ যেমন: সাহায্যকারী সংস্থাসমূহ, আইএনজিও, এনজিও এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সর্বাত্মকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকে পথ-শিশুদের জন্য একটি দীর্ঘ-মেয়াদী স্বয়ংসম্পন্ন ও বিস্তৃত পরিসরে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যদিকে, পথ-শিশুদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্ড়রিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া পথ-শিশুদের সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন ধরণের যত বেশী সংখ্যক সম্ভব প্রকল্প নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এই সেক্টরে কর্মরত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে পথ–শিশুদের অবস্থা উন্নয়নে তাদের সীমিত সম্পদ নিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার উপায় বের করার কাজে মনোনিবেশ করা উচিত। পথ-শিশুদের সমস্যা সমাধানে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন প্রকার

প্রতিষ্ঠানসমূহে কমিউনিটি ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে এলাকা ভিত্তিক জনগণের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ নিতে পারে। সর্বস্তরে শিশু অধিকার সংক্রান্ত সব রকম সচেতনতামূলক কার্যক্রম একই সাথে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সরকারী দল উভয়েরই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া, অত্যাবশ্যক কার্যক্রম হিসাবে এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন রকম এডভোকেসী সংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কেস স্টাডি # ১

ফিরোজ আলম, মাত্র ১২ বছরের এক শিশু যে কর্মক্ষেত্রে গত ৬ ফ্রেব্রুয়ারী ২০১০ সালে তার মলিক কর্তৃক ভীষণভাবে অমানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। নির্যাতিত শিশুর পিতা-মাতা অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত দরিদ্র। ফিরোজের পিতা একজন রিকসা চালক এবং মাতা একজন গৃহিনী। ফিরোজরা দুই ভাই ও দুই বোন। তারা সকলে মিলে একটি বস্তিতে বাস করে। এই বস্তিটি বিত্তশালী ব্যক্তিদের এলাকার পাশে অবস্থিত। এলাকাটির নাম 'খুলসী' যা চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের আওতাভূক্ত। যেহেতু ফিরোজের পরিবারের অর্থিক অবস্থা একেবারেই ভাল নয় এবং পিতার একমাত্র আয় দিয়ে সংসার চালানো খুবই কষ্টসাধ্য, তাই পরিবারে একটু অর্থ সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে ফিরোজ তার বস্তির পাশে একটি চা-স্টলে সাহায্যকারী হিসাবে কাজ নেয়। প্রতিদিন সে সকাল ৫:০০ টায় কাজে যোগ দেয় এবং রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত কাজ করে। কোন এক সকালে ফিরোজ তার কাজে গেলে চা-স্টলের সাথের এক মুদির দোকানদার তাকে সাত (৭) হাজার টাকা (আনুমানিক ইউএসডি ৮৮) চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে। স্বভাবতই সে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করা। কিন্তু তার কথা অগ্রাহ্য করে মুদির দোকানের মালিকের ছেলে কয়েকজন বন্ধু নিয়ে ফিরোজকে বেদম প্রহার করে। তারা ফিরোজকে পরের দিন দুপুর পর্যন্ত আটকে রেখে ক্রমাগত নির্যাতন করে। ফিরোজের পিতা-মাতা বিষয়টি জানার পরে ছেলেকে উদ্ধারের জন্য তাদের আস্তানায় যায়। মালিকের ছেলে ও তার বন্ধুরা মিলে তাদেরকেও বেদম প্রহার করে। যখন বিষয়টি আশেপাশে জানাজানি হয়ে যায় তখন 'যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' নামক একটি এনজিও স্থানীয় লোকজন ও সাংবাদিকদের সহায়তায় শিশুটিকে উদ্ধার এবং নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের একটি সদস্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে যুগান্ড়র সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। তারা স্থানীয় থানায় একটি কেস লিপিবদ্ধ করে (কেস নং ৫; তারিখ-৪ ফেব্রুয়ারী ২০১০, বাংলাদেশ পেনাল কোড সেকশন ৩২৩/৩২৪/৩৪২)। পুলিশ সাথে সাথে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম ও যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থা একত্রে শিশুটির সকল চিকিৎসা ভার বহন করে। ফিরোজ সুস্থ হয়ে উঠার পর বিএসএএফ তার পিতাকে একটি রিকসা কিনে দেয়। সেই রিকসার আয় দিয়ে ফিরোজের পিতা পরিবারের মৌলিক খরচ নির্বাহ এবং ছেলের পড়াশুনার খরচ বহন করে। উপরন্তু, ফিরোজের পিতা ফিরোজের নামে ব্যাংকে একটি একাউন্ট খুলে নিয়মিতভাবে কিছু টাকা সেখানে জমা করে।

ফিরোজ ও তার পরিবার। সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ফিরোজের পিতার হাতে রিকসা তুলে দিচ্ছেন।

জন্ম নিবন্ধন: শিশু অধিকার রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ

ভূমিকা

বাংলাদেশে গত ৩ জুলাই ২০০৬ সালে 'জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নীতি ২০০৪' কার্যকর হয়। রাষ্ট্রীয় নীতিটি ২০০৪ সালে প্রণীত হলেও তা বাস্তবায়ন হতে দু'বছর সময় লাগে। এই আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশী যে কোন শিশু দেশের ভিতরে এবং বাইরে যেখানেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন তার নিবন্ধন করতে হবে এবং অন্য অর্থে তার নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। শিশুদের অধিকার নিশ্চিত ও বাস্ড়বায়ন করতে জন্ম নেয়া শিশুদের নিবন্ধন করার বিষয়টিকে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশে ৩ জুলাই জাতীয় দিবস হিসাবে পালিত হয়।

শিশু অধিকার কনভেনশনের আর্টিকেল ৭ অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর নাম, পরিচয় এবং জাতীয়তার স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। শিশু অধিকার উপভোগ করতে জন্ম নিবন্ধন হচ্ছে প্রথম ও সুনির্দিষ্ট ধাপ যেখানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিজস্ব অস্তিত্বের প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করা যায় এবং শিশুর আইনী মর্যাদা পাওয়ার বিষষটিও স্বীকৃত হয়।

বাংলাদেশে জন্ম নিবন্ধনের প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় ২০০১ সালে। সেই সময় একই সাথে নগর ও গ্রামাঞ্চলে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাইলট ভিত্তিতে কার্যক্রম শুরু করা হয়। জন্ম নিবন্ধনের বিষয়টির সাথে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, সম্পদ বন্টন ও দেশের সামগ্রিক কাজের অগ্রগতির গুণগত বিশ্লেষণের যোগাযোগ রয়েছে। জাতীয় অগ্রগতিকে সঠিকভাবে মনিটরিং ও মূল্যায়ন করার জন্যও জন্ম নিবন্ধন অত্যাবশ্যক, কারণ এটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কার্যকর কৌশল তৈরী করতে প্রয়োজনীয় ডেমোগ্রাফিক ডাটা সংগ্রহে সহায়তা করে। জন্ম নিবন্ধন জনসংখ্যা সম্পর্কে বিশ্বস্ত তথ্য দিয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাগরিকদের পাবলিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য জন্ম নিবন্ধনকে বাধ্যতামূলক করেছে। মোট ১৭টি বিষয়ের ক্ষেত্রে সরকার জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করেছে; এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, বিয়ের ক্ষেত্রে, সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকরীতে নিয়োগপত্র প্রাপ্তি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভূমি নিবন্ধকরণ, ভোটের অধিকার প্রয়োগ, ইত্যাদি।

শিশুদের তথ্যসমূহ সংরক্ষণের মূল দায়িত্ব স্থানীয় সরকার বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ জন্ম নিবন্ধনের বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে ১০০ ভাগ জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, তাই স্থানীয় সরকার বিভাগ এই বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আন্তরিকভাবে লক্ষ্যে অর্জনে কাজ করে চলেছে।

অনলাইন জন্ম নিবন্ধন

বাংলাদেশ সরকার অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সুবিধা ২০১০ সাল থেকে শুরু করে। প্রথম ধাপে মোট নয় (৯)টি জেলায় কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি পদ্ধতি চালু করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে, ২০১১ সালে, মোট ২০টি জেলাকে ডাটা এন্ট্রির আওতাভুক্ত করা হয় । বর্তমানে এই ২৯টি জেলায় কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে এবং বাকী জেলাগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে এই পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ইতোমধ্যে ২৬টি জেলার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি প্রক্রিয়ার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বাকী নয় (৯)টি জেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। নিচে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতির আওতাভূক্ত ২৯টি জেলায় নাম উলেণ্টখ করা হলো:

টেবিল ০.২: জেলাসমূহের নাম - অনলাইন জন্ম নিবন্ধন

গোপালগঞ্জ	কক্স বাজার	খুলনা	যশোর
ঝিনাইদহ	মাগুরা	নড়াইল	নীলফামারী
লালমনিরহাট	বাগেরহাট	সাতক্ষিরা	কিশোরগঞ্জ
নেত্রকোণা	জামালপুর	রাঙামাটি	বান্দরবন
খাগড়াছড়ি	সিলেট	হবিগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
ভোলা	পিরোজপুর	পটুয়াখালী	বরগুনা
সিরাজগঞ্জ	রংপুর	গাইবান্ধা	কুড়িগঞ্জ
গাজীপুর			

সাধারনত, দেশের বাইরে বসবাসকারী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মূখীন হয়ে থাকে। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে ১৭টি দূতাবাসে (এম্বেসী ও হাই কমিশন) অনলাইন জন্ম নিবন্ধনের ব্যবস্থা করেছে এবং যত দ্রুত সম্ভব অন্যান্য সকল দূতাবাসেও একই রকম অনলাইন জন্ম নিবন্ধনের সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠেয় বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় একটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেছে, তাহলো, সরকার সত্যিকার অর্থেই জনগণকে জন্ম নিবন্ধনের বিষয়ে আগ্রহী ও জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে, সকল নাগরিক পরিবারের সবাইকে নিয়ে জন্ম নিবন্ধন করেছে। এক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয়ে সরকারী সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকার জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক করে, যা জনগণকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কাজেই মনে হচ্ছে, সরকারের পক্ষে তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় খুলনা ও রাজশাহীর অংশগ্রহণকারীরা আরো উল্লেখ করে যে, যদিও তারা রাজধানী শহর ঢাকার বাইরে রয়েছে তথাপি নিজেদের এলাকার সরকারী অফিস থেকে জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে তাদের কোন রকম সমস্যা হয় নাই। এই ধরণের বিকেন্দ্রিকরণ প্রক্রিয়া নাগরিকদের জন্য সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

সরকারী ওয়েবসাইট: জন্ম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ

যে সকল বাংলাদেশী নাগরিক দেশের বাইরে বসবাস করে তাদের সুবিধার্থে বাংলাদেশ সরকার অনলাইন জন্ম নিবন্ধন তথ্য পদ্ধতি (অনলাইন বিআরআইএস) প্রবর্তন করেছে। বাংলাদেশী হিসাবে প্রতিটি নাগরিক অনলাইনে বাংলাদেশ সরকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তাদের জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ড় তথ্য আপলোড করতে পারবে এবং একই সাথে সার্টিফিকেটে যে তথ্য ছাপা হবে তার সঠিকতা যাচাইয়ের সুযোগ পাবে। জন্ম নিবন্ধনের সরকারী ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে <br.lgd.gov.bd>। যে কোন ব্যক্তি কোন রকম ই-মেইল একাউন্ট না খুলেই শুধূ মাত্র নিবন্ধীকৃত নম্বর ও জন্ম তারিখ ব্যবহার করেই যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। তারমানে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে হলে তারজন্য কোন রকম ব্যবহারকারীর নাম (username) বা চিহ্নিতকরণ সংকেত (password) ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না। এই ধরণের তাৎক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নাগরিকদের অনলাইন সুবিধা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে এবং নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হবে।

জন্ম নিবন্ধন কভারেজ

বাংলাদেশে ২০০৫ সাল থেকে জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য রেকর্ড করার কার্যক্রম শুরু করে। সেই বছর জন্ম নিবন্ধন তথ্যের কভারেজ ছিল মাত্র ৯.৪৩% । তারপর জন্ম নিবন্ধন কভারেজ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালের শেষে এই কভারেজ দাঁড়িয়েছে ৯৭.৩১% ।

টেবিল ০.৩: বছরভিত্তিক জন্ম নিবন্ধন কভারেজ

বছর	জনসংখ্যা	জন্ম নিবন্ধিত জনসংখ্যা	জনসংখ্যা কভারেজ %	সার্টিফিকেট বিতরণ %
২০০৫	**১৩৭,৭০০,০০০**	**১২,৯৮২,৫৫৮**	**৯.৪৩**	**৯.৪৩**
২০০৬	**১৩৯,৯০০,০০০**	**২১,২১৪,৩৬৬**	**১৫.১৬**	**১৫.১৬**
২০০৭	**১৪২,২০০,০০০**	**৭০,৯৫০,৯৪৪**	**৪৯.৯০**	**২০.৩৮**
২০০৮	**১৪৪,৫০০,০০০**	**১২৬,৭১৯,৭৭৫**	**৮৭.৭০**	**৫১.৫৮**
২০০৯	**১৪৬,৯০০,০০০**	**১৩৫,৭৫০,৬৭৭**	**৯২.৪১**	**৬২.৬৩**
২০১০	**১৪৯,৩০০,০০০**	**১৪০,৫১১,৯৬৩**	**৯৪.১১**	**৬৯.৩৯**
২০১১	**১৫১,৭০০,০০০**	**১৪৭,৬২৩,৪৬৪**	**৯৭.৩১**	**৭৫.০৯**

পরিসংখ্যান থেকে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে যে, বাংলাদেশ সরকারের ২০১৩ সালের মধ্যে শতভাগ জন্ম নিবন্ধনের যে টার্গেট স্থির করেছে তা অর্জন করার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশ সরকার সফলভাবে এই বিষয়ে জনগণকে উদ্দিপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তৃণমূল পর্যন্ত সরকারের সর্বাত্মক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম সকলকে জাগ্রত করতে সামর্থ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে এনজিও, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় সরকার বিভাগকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করছে। সরকারী প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোট

৪১টি জেলায় ইতোমধ্যে ১০০ ভাগ জন্ম নিবন্ধন কভারেজ নিশ্চিত করেছে। মোট ১৭টি জেলায় শতকরা ৯০ ভাগের অধিক জন্ম নিবন্ধনের আওতায় এসেছে, চারটি জেলার কভারেজ শতকরা ৮০ ভগের উপরে এবং অন্য দুটি জেলার কভারেজ প্রায় ৭৫%।

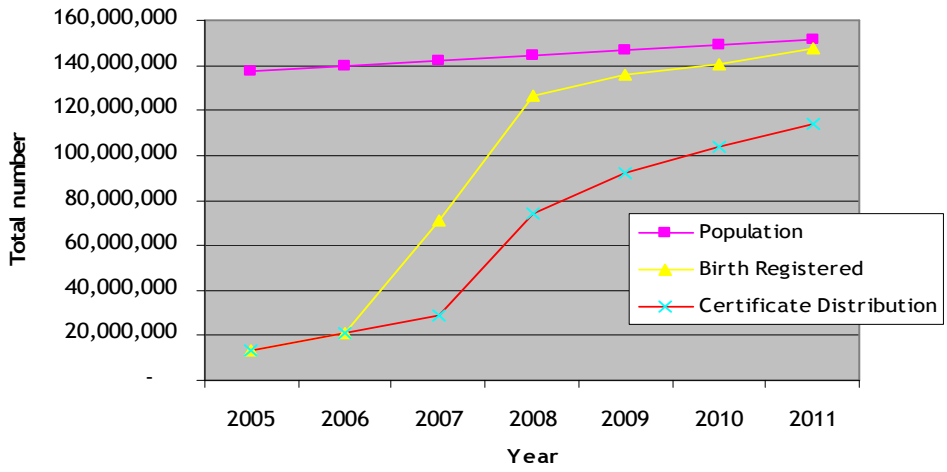

চিত্র ০.১: জন্ম নিবন্ধন এবং সার্টিফিকেট

আইনী বাধ্যবাধকতা এবং শাস্তির বিধান

বর্তমানে বাংলাদেশে জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিক জন্ম সম্পর্কিত তথ্য নিবন্ধন করতে বাধ্য থাকবে। আইন ভঙ্গকারীদের জন্য সরকার শাস্তির বিধান করেছে। আইন অমান্যকারী ব্যক্তিদের জন্য ৫০০ টাকা জরিমানা অথবা কাজ ছাড়া দুই মাসের জেল অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হওয়ার বিধান রাখা আছে। সরকারী নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন না করার ক্ষেত্রেও নাগরিকদের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করার বিধান রয়েছে।

জন্ম নিবন্ধনের বর্তমান ফি (চাঁদা)সমূহ

শুরুর দিকে সাধারন জনগণকে আকৃষ্ট ও প্রণোদনা প্রদান করতে জন্ম নিবন্ধনের জন্য কোন রকম চাঁদা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। তারমানে সকল জনগণ বিনা খরচে তাদের পরিবারের সকল সদস্যদের জন্ম নিবন্ধন করার সুযোগ ভোগ করেছে। জনগণকে জন্ম নিবন্ধনের বিষয়ে সামগ্রিকভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এটি ছিল এক ধরনের কৌশল। বিনা খরচে জন্ম নিবন্ধনের ঘোষণা ২০০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর ছিল। পরবর্তীতে ১৮ বছর পর্যন্ত সকল বয়সের নাগরিকদের জন্য বিনা খরচে জন্ম নিবন্ধনের সময়সীমা বর্ধিত করা হয়। বর্ধিত সময়সীমা জুন ২০১০ সাল পর্যন্ত করা হয়। সরকার জনগণের আগ্রহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আরেক ধাপ সময় বর্ধিত করে; এ সময় সর্বস্তরের জনগণের মাঝে জন্ম নিবন্ধনের বেশ সাড়া পাওয়া যায়। তারপর একটি নূন্যতম চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তবে এখনও দুই বছরের নীচের শিশুদের জন্য বিনা খরচে জন্ম নিবন্ধনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

টেবিল ০.৪: জন্ম নিবন্ধনের বর্তমান ফি (চাঁদা)

বিষয়	ফি	
	ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা	সিটি করপোরেশন ও কেন্টমেন্ট বোর্ড
দুই বছরের নিবন্ধন ফি	নাই	নাই
দুই বছরের বেশী সময়ের জন্য প্রতি বছর নিবন্ধন ফি	৫.০০ টাকা	১০.০০ টাকা
মূল জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট বিতরণ	নাই	নাই
২য় সার্টিফিকেট কপি বিতরণ	২৫.০০ টাকা	২৫.০০ টাকা
সার্টিফিকেট পরিমার্জন ও পরিবর্তন	১০.০০ টাকা	১০.০০ টাকা

পরিশেষ

সামগ্রিকভাবে জন্ম নিবন্ধন ব্যবস্থার অগ্রগতি খুবই সন্তুষ্টজনক। আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে বাকী ১.৬৬% জনগণকে জন্ম নিবন্ধেনের আওতায় আনা সম্ভব হবে বলে সরকারীভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। কাজেই আশা করা যায় যে, সরকারীভাবে ঘোষিত সময়ের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনের শতভাগ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে এবং পরবর্তীতে শুধুমাত্র নতুন জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিবন্ধনের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করার পর্যায় আসা সম্ভব হবে। তবে, বাংলাদেশে আগামী দিনগুলোতে নিয়মিতভাবে একটি কম্পিউটার ভিত্তিক স্থায়িত্বশীল ডাটা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য বর্তমান সফট্ওয়ার ব্যবস্থার উপর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই কম্পিউটার নির্ভর ব্যবস্থাপনায় বিশৃস্ড়ভাবে জন্ম নিবন্ধন সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য মজুত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে যেন দেশে ও বিদেশের যে কোন স্থান থেকে যেকোন বাংলাদেশী তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য আপলোড করতে পারে এবং মজুতকৃত তথ্যে থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেতে সক্ষম হয়।

শিশুদের বিংদ্ধে আভ্যন্তরীণ নির্যাতন

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ যেখানে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জনগণ দারিদ্রসীমার নিচে (৩১.৫%) বসবাস করে। কাজেই শিশুরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে এটাই স্বাভাবিক। শিশুরা সাধারনত পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও সামাজিকভাবে রক্ষা বা প্রতিরোধের সুবিধা প্রাপ্তির মত মৌলিক অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে হত-দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অতিমাত্রায় কষ্ট ভোগ করতে হয়। ফলে সেইসব অতি-দরিদ্র পরিবারগুলোর পিতামাতারা অর্থ উপার্জনের জন্য নিজেরা যে শুধু তাদের শারীরিক শ্রম বিক্রি করে তা নয়, উপরন্তু, তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদেরও অর্থ উর্পাজন কর্মকান্ডে যুক্ত হতে বাধ্য করে। সেই সকল পিতামাতারা হয়তো শিশু অধিকার সম্পর্কে অবগত বা সচেতন নয় অথবা নিজেদের সুবিধার্থে শিশু অধিকারের বিষয়টি গ্রাহ্য করে না। ফলে অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্যহীন পরিবারের শিশুরা অনাকাংক্ষিতভাবে পিতামাতার চাপে শ্রম-শিশু হিসাবে নিজেদের পরিচিত করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা বিভিন্ন বাড়ীতে শ্রম-শিশু হিসাবে কাজ করে বা এই কাজেই পিতামাতারা তাদের পাঠিয়ে থাকে। এই মেয়ে শ্রম-শিশুরা বিভিন্ন বাসা-বাড়ীতে কাজ করার সময় নানা রকম অনাকাংক্ষিত সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং মানসিক ও শারীরিক উভয় ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এমনকি শিশু মেয়েদের বয়স, লিঙ্গ ও অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাজন বেতিরেখে মেয়ে শ্রম-শিশুদের প্রতি নির্যাতন প্রতি নিয়ত বেড়েই চলেছে। সাধারণভাবে, যৎসামান্য কিছু সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ যেখানে শিশু অধিকার নিয়ে কাজ হয়, তার বাইরে এদেশে শিশুরা একেবারেই নিরাপদ নয়।

বর্তমানে দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শিশু গৃহ-পরিচারিকার কাজ করে। এক জরীপে দেখা গেছে চার (৪) লক্ষ ২১ হাজার শিশু সারাদেশে বিভিন্ন বাসা-বাড়ীতে কাজ করে। বাসা-বাড়ীতে কর্মরত শ্রম-শিশুদের তিন চতুর্থাংশ মেয়ে শিশু। বাড়ীতে কর্মরত শ্রম-শিশুরা অনেক বেশী নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। কারণ, তারা চার দেয়ালের মধ্যে বন্ধ অবস্থায় কাজ করে। প্রায় সব বাসা-বাড়ীতে কর্মরত শ্রম-শিশুরা সপ্তাহে সাতদিন কাজ করে; তাদের অবসর বা সাপ্তাহিক ছুটি বলতে কিছু নেই। এসব বাড়ীতে কর্মরত শ্রম-শিশুদের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মালিকের বাড়ীতেই রাত্রিযাপন করে। সামগ্রিক পরিস্থিতি একটি বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে, তাহলো, বাড়ীতে কাজ করা শ্রম-শিশুরা সবদিক থেকে সম্পূর্ণভাবে মালিকের উপর নির্ভর করে এবং সাধারণত তাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া থাকে। বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, বাড়ীতে কর্মরত শ্রম-শিশুদের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ কাজের সময় বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকে, যেমন: বিভিন্নভাবে তিরস্কার করা, ধাপ্পর মারা, ইত্যাদি। কখন কখন নির্যাতনের মাত্রা অত্যন্ত বেশি থাকে, উপরন্তু, একটা বড় অংশের শ্রম-শিশুরা মাস শেষে কোন রকম বেতন পায় না। বেতন না পাওয়ার বিপরীতে তারা এই সব শিশুদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। অপরদিকে বাড়ীতে কর্মরত শ্রম-শিশুরা সাধারনত মাসিক ভিত্তিতে মজুরী পায় যা শ্রম-শিশুর নিকট আত্মীয়রা গ্রহণ করে থাকে।

বাড়ীতে নির্যাতন একেবারেই অনাকাংক্ষিত একটি বিষয়; বাড়ীতে শ্রম-শিশু বলতে সাধারণ মেয়ে গৃহ-পরিচারিকাকে বুঝায় যা প্রধানতম একটি সমস্যা। এই সমস্যাটি প্রতি নিয়ত বেড়ে চলেছে।[১৩] বর্তমানে পরিবারের সাধারণ ধারা অনুযায়ী একান্নবর্তী পরিবারের স্থলে একক পরিবার ধারণার প্রচলন শুরু হয়েছে। পারিপার্শ্বিক বাস্তবতায় বর্তমান জীবন ব্যবস্থায় মানুষ একক পরিবার ধারণা উপর নির্ভর করে বা করতে হয়। এটি একটি কঠিন বাস্তবতা। যদিও শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়টি লক্ষ্যণীয়, তবে নগরাঞ্চলে এই বাস্তবতার ভয়াবহতা অনস্বীকার্য। এইরূপ বাস্তবতায়, যে কোন পরিবারে নানান ধরণের কাজকর্ম সম্পন্ন করার জন্য মেয়ে গৃহ-পরিচারিতার অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। ফলে দেখা যায়, বাড়ীতেই যৌন হয়রানির মত ঘটনা ঘটে থাকে। এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, পেশাদার শিশু যৌনকর্মীদের প্রায় ছয় (৬) শতাংশ শিশু পারিবারিক পর্যায়ে যৌন হয়রানির থেকে বাঁচার জন্য গৃহত্যাগ করেছিল।[১৪]

গৃহ পরিচালিকার কাজে যুক্ত হওয়ার কারণসমূহ

প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র পিতা-মাতারা সুনির্দিষ্ট কারণবশত তাদের সন্তানদের বিভিন্ন বাড়ীতে কাজ করতে পাঠিয়ে থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো:

- পিতামাতার শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং অজ্ঞতা হচ্ছে প্রধান কারণ, যারজন্য তারা নিজেদের অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের বিভিন্ন কাজে পাঠিয়ে থাকে;
- নিজেদের সুবিধার্থে নিজের শিশু সন্তানদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে;
- শিশু সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্বহীনতা;
- ভীষণভাবে নিয়তির উপর নির্ভর করে এবং ধরে নেয় যে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি নেই।

কর্মরত বাড়ীর পরিস্থিতি

সাধারণত বাড়ীতে কর্মরত শিশুরা বাড়ীর কোন না কোন সদস্যদের দ্বারাই নির্যাতিত হয়ে থাকে। এটি একটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত সমস্যা; কেননা সমস্যাটি গ্রাম ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই একই রকম। বিদ্যমান সমস্যাটির প্রধান প্রধান কারণসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো:

- সাধারণভাবে গৃহ পরিচারিকাকে বাসার মানুষ একজন মজুরী প্রদান করা ব্যক্তি হিসাবে গন্য করে;
- একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে কাজের বিনিময়ে অর্থ প্রদান করা;
- কর্মরত শিশুর শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের বিষয়টি কখনই বিবেচনা করে না;
- পূর্বে স্থিরকৃত ধারণা থেকে কর্মরত শিশুটিকে প্রধানত 'ক্রীতদাস' হিসাবে বিবেচনা করে;
- বাড়ীর সদস্যদের সকল ধরনের হতাশা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে কর্মরত শিশুকে বিবেচনা করে;

[13] Stepping up Child Protection Save the Children 2010
[14] INCIDIN Bangladesh (2008). Rapid assessment: Commercial Sexual Exploitation of Children and Adolescents in Bangladesh. UNICEF

- কর্মরত শিশুদের কাজ থেকে বেআইনী ও অযৌক্তিক সুবিধা নিয়ে থাকে।

গৃহ পরিচালিকা হিসাবে কাজ করার চাহিদা শহরাঞ্চলগুলোতে অত্যন্ত বেশি। নগরাঞ্চলের জটিল জীবন ব্যবস্থায় গৃহ পরিচালিকা রাখার অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর দ্রুত নগরাঞ্চলের দিকে মানুষ ক্রমাগত ধাবিত হওয়ার ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করেছে।

শিশুদের যৌন নির্যাতন

বাংলাদেশের বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থায় শিশুদের যৌন নির্যাতন একটি বিশাল সমস্যা। শিশুরা ঘরে ও বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই পরিবারের বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার বিশাল ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এই ধরণের নির্যাতন সাধারণত বিদ্যালয়ে, নিজ এলাকা-মহল্লা বা কাজের স্থানে ঘটে; তারমানে শিশুরা স্বাভাবিকভাবে যেসকল জায়গায় আসা-যাওয়া করে সেখানেই নির্যাতিত হয়। অথচ আমাদের সমাজে এই বিষয়টিকে একটি নিষিদ্ধ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে জাতীয় বা মহল্লা পর্যায়ে আলোচনা করা হয় না। ফলে শিশু নির্যাতন বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য কখনোই কোথাও পাওয়া যায় না বা প্রাসঙ্গিক তথ্য বা পরিসংখ্যান না পাওয়ার এটাই প্রধান কারণ। সমস্যাটি গুরুত্ব দিয়ে ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য কোন রকম আলোচনা করার বিষয়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট সকলের অনাগ্রহের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণত দেখা যায় যারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, প্রতারিত হয়েছে এবং পাচার হওয়ার পর ফিরে আসতে সামর্থ্য হয়েছে এবং পুনর্বাসনের অবস্থায় রয়েছে, তারা জীবন সম্পর্কে প্রচন্ড হতাশায় ভোগে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরে। ফলে তারা সরাসরি আইনের কোন সহায়তা থাকার বিষয়টি প্রতি নূন্যতম আগ্রহ দেয়ায় না যেখানে তাদের প্রতিরক্ষার জন্য অধিকারের বিষয়ে বলা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সুবিচার পাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। শিশু অধিকার কনভেনশন (সিআরসি) সম্পর্কেও তাদের একই রকম মনোভাব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইচআইভি/এআইডিএস -এর মারাত্তক ঝুঁকি তাদের জীবনকে দূর্বিষহ করে তোলে। তারা নিয়মিতভাবে নেশাগ্রস্থ জিনিষ গ্রহণ করে এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন করে, যা অবধারিতভাবে তাদেরকে নিষিদ্ধ জীবনের দিকে ধাবিত করে। ফলে তাদের জীবন অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নতুন করে জীবন শুরু করার বিষয়টি তাদের কাছে স্বপ্নই থেকে যায়। তবে কিছু কিছু এনজিও নির্যাতিত মেয়েদের পুনর্বাসনের জন্য দাতা সংস্থাগুলোর সহায়তায় কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে; অনেক সময় সেই স্বল্প সংখ্যক উদ্যোগ উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়।

শিশুদের বিরুদ্ধে সব ধরণের যৌন হয়রানী দূর করতে শিশু অধিকার কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রটোকল অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দলিল। বাংলাদেশ এই আইনী দলিলে ২০০০ সালে স্বাক্ষর করে দলিলটি দেশের পক্ষে অনুমোদন করে। বাংলাদেশ দলিলটিতে স্বাক্ষর করা প্রথম ১০টি রাষ্টের মধ্যে অন্যতম। স্বাক্ষরকারী দলিলটি

২০০২ সাথে এদেশে কার্যকর হয়। বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে এই দলিলের উপর ভিত্তি করে প্রথম প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রদান করে। এই রিপোর্টটি বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে শিশু অধিকারের সাথে যেসব সংশিণ্টষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ, সংস্থসমূহ ও অন্যান্য পক্ষসমূহ সাথে আলোচনা করে প্রতিবেদনটি তৈরী করে।[১৫]

গৃহ পরিচালিকার কাজে নিযুক্তদের দৃষ্টিভঙ্গী

গৃহ পরিচারিকার কাজে নিয়োজিত শিশুরা অন্যের বাড়ীতে কাজ করার সময় নিজেদের খুবই অনিরাপদ মনে করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুরা তাদের পিতামাতার কারণে অন্যের বাড়ীতে কাজ করতে বাধ্য হয়। অন্যের বাড়ীতে শিশুদের সারাদিনব্যাপী কাজ করতে হয় বলে শিশুরা বাসা-বাড়ীতে কাজ করতে অনাগ্রহী হয়। অন্যের বাড়ীতে কাজ করার সময় তাদের পরিবারের সকলের চাহিদা পূরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে সময়মত ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে না পারলে তাদেরকে শারীরিক নির্যাতনও ভোগ করতে হয়। সারাদিন তাদের অবসর বলে কিছু তাকে না।

বাসা-বাড়ীতে কর্মরত অনেক শিশু অন্যের বাড়ীতে রাত্রিযাপন করতে আগ্রহী নয়, কেননা এক্ষেত্রে যৌন হয়রানি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শুধুমাত্র কিছু অর্থ প্রাপ্তির আশায় পিতামাতারা এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নেয় না। এই সকল তথ্য সরাসরি গৃহে কাজ করা শিশুদের কাজ থেকে সংগ্রহ করা গেছে। বাংলাদেশের বন্দর নগরী চট্টগ্রামে কর্মরত শিশুদের নিয়ে একটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে এ সকল অনুভূতি শিশুরা সরাসরি প্রকাশ করে।

[15] NGO Report on the Optional Protocol to the Convention on the Child on the sale of Children, Child Prostitution & Child Pornography, Bangladesh National Women Lawyers' Association (BNWLA), Bangladesh

কেস স্টাডি # ২

টুকটুকি খাতুন, নয় (৯) বছরের এক শিশু যে খুলেন দফাদারের বাসায় গৃহ পরিচারিকার কাজ করছিল। খুলেন দফাদার মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার অধীনে জোতারপুর গ্রামে বসবাস করে। টুকটুকির পড়াশুনার প্রতি খুবই আগ্রহ ছিল এবং পড়াশুনা করে অনেক বড় হওয়া তার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু তার পিতার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। টুকটুকির পিতা তাকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের উদ্যোগ নেয় এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তাকে দফাদারের বাড়িতে গৃহ-পরিচারিকার কাজে পাঠিয়ে দেয়। গত ১১ এপ্রিল ২০১০ সালে টুকটুকি দফাদারের বাড়ীতে না যেয়ে তার স্কুলে গিয়েছিল। এটিই তার জীবনে কাল হয়ে দেখা দেয়। টুকটুকির ক্লাশ করার খবর পেয়ে দফাদারের তিন ছেলে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে স্কুলে ছুটে আসে। টুকটুকি ক্লাশ করা বাদ দিয়ে তাদের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানালে তারা প্রভাব খাটিয়ে জোর করে টুকটুকিকে নিয়ে যায়। বাসায় নিয়ে তারা টুকটুকিকে প্রচন্ডভাবে প্রহার করে। তারা টুকটুকির হাতের ও পায়ের আঙ্গুল থেতলে দেয় এবং হাতুড়ী ও ছুরি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে ভয়াবহভাবে নির্যাতন করে। পাশের বাসার একজন টুকটুকির চিৎকার শুনতে পায়। সে দৌড়ে দফাদারদের বাসায় আসে এবং টুকটুকিকে উদ্ধার করে মুজিবনগর সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিএসএএফ-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর জেলার "মানব উন্নয়ন কেন্দ্র" নামক এনজিও টুকটুকিকে পুনর্বাসন সহযোগিতা দিতে এগিয়ে আসে। টুকটুকি যেন অন্যের বাড়ীতে কাজ না করে পড়াশুনা করতে পারে তারজন্য বিএসএএফ টুকটুকির মাকে একটি সেলাই মেশিন প্রদান করে। তাছাড়া, বিএসএএফ টুকটুকিকে পড়াশুনা করার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র, স্কুলের পোশাক, ব্যাগ ইত্যাদি প্রদান করে। স্থানীয় সংবাদপত্রে বিএসএএফ-এর সহযোগিতা প্রদান বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

নির্যাতিত শিশু টুকটুকি ও তার পিতা-মাতা

বাংলাদেশে শিশু পাচার পরিস্থিতি

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি ঘন জনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র যেখানে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে এবং তারা প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রাম করছে। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সব সময় নিজেদের অর্থ উপার্জনকারী কার্যক্রমের সাথে যুক্ত রাখার প্রচেষ্ঠায় নিবেদিত। শিশুরাও এই অনুশীলনের বাইরে নয়। বর্তমানে কিছু অপ্রতুল প্রকল্পের আওতায় সরকারী ও এনজিওরা শিশুদের অবস্থান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর কাজ করছে এবং তাদের সম্পর্কে বিস্তারিক তথ্য সংগ্রহ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য ও বিশস্ত তথ্য-উপাত্তে অভাব হচ্ছে প্রধান সমস্যা ।

বাংলাদেশে সাধারনভাবে শিশুদের যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও পাচার বিষয়গুলো নিষিদ্ধ বিষয় হিসাবে দেখা হয়। এই বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন মহলের উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়, তেমনি এই বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা বা প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগও খুব একটা চোখে পরে না। সে কারণেই শিশু পাচারের বিষয়ে গুণগত তথ্য উপাত্ত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু, এই সংক্রান্ত যে সকল তথ্য ও ডাটা উপাত্ত পাওয়া যায় তা প্রকৃত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য নয় বলে প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে আরেকটি বিবেচনার বিষয় হচ্ছে শিশুরা নিজেরাও এক্ষেত্রে তাদের আইনী অধিকার সম্পর্কে অসচেতন, কারণ তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানার কোন রকম সুযোগ বা ব্যবস্থা নেই।

এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১৩ হাজার শিশু পাচার হয়েছে। মেয়ে শিশুরা স্থলপথে পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে যৌন কাজে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে এবং ছেলে শিশুরা উটের জকি হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে পাচার হয়।[১৬] শিশু পাচার, যৌন হয়রানি ও নির্যাতন হচ্ছে শিশুদের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত পাঁচ বছরে প্রায় ১৩ হাজার শিশু এদেশ থেকে পাচার হয়েছে। আনুমানিক ২০ হাজারেরও বেশী মেয়ে শিশু পথে-ঘাটে পতিতাবৃত্তির সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে।[১৭] একই কাজের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মেয়ে শিশু ভারতেও পাচার হয়েছে। উটের জকি হিসাবে ব্যবহারের বিষয়টিও এখনও আলোচনায় রয়েছে। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ সমস্যা শিশু নির্যাতন তো রয়েছেই যেখানে শিশুরা অহরহ যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে; তাছাড়া যৌতুক না দেয়ার জন্য বিভিন্ন রকম নির্যাতনও হয়ে থাকে।[১৮]

[16] Human Rights Watch, World Report: Bangladesh 2009 http://www.hrw.org/en/world-report/2009/bangladesh
[17] Global march 2009 www.globalmarch.org/resourcecentre/
[18] Stepping up Child Protection Save the Children 2010

আইনগত নীতিমালা

শিশু অধিকার কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রটোকল, যেখানে শিশু বিক্রয়, শিশু যৌনকর্মী ও শিশু, পর্ণোগ্রাফি বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে, বাংলাদেশ সরকার সেই প্রতিবেদনে/দলিলে স্বাক্ষর করেছে। এই আইন অনুমোদনকারী ও স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশ একটি ও অন্যতম। এই আইনটি বাংলাদেশ ২০০০ সালে অনুমোদন করে।

শিশু পাচারের গমনপথ

বাংলাদেশের চারিদিক প্রধানত ভারত দ্বারা পরিবেষ্ঠিত। ফলে শিশু ও নারী পাচারের জন্য দুই দেশের বর্ডার অঞ্চলের স্থলপথ ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে প্রধানত যশোর বর্ডারকে পাচারের প্রধান স্থলপথ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একাজে সঙ্গবদ্ধ দুষ্টচক্র কাজ করে; তারা আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা ও জেলাসমূহ থেকে পাচারের জন্য শিশু ও নারীদের একত্রিত এবং সময়মত বর্ডার পার হওয়ার ব্যবস্থা করে। একই ধরণের পদ্ধতি অনুসরণের ব্যবস্থা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী বর্ডারেও লক্ষ্য করা যায়। এই দুইটি উল্লেখযোগ্য বর্ডারের বাইরে কুমিল্লা জেলার বর্ডার এলাকাকে অনেক সময় ব্যবহার করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ট ও বিশ্বস্ত তথ্য উপাত্ত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। সঙ্গবদ্ধ দুষ্টচক্রের হাত থেকে অনেক সময় শিশু ও নারীদের উদ্ধারের ঘটনা থেকে অনুমান করা হয় যে, এই সকল অঞ্চলগুলো শিশু ও নারী পাচারের পথ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পাচারের ঘটনা সংগঠনের কারণসমূহ

মূলত শিশু অধিকার সম্পর্কে শিশুদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে এবং একইসাথে তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে জানে না। যেহেতু শিশুরা অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টায় মগ্ন থাকে, ফলে শিশু অধিকার সম্পর্কে নিজে জানা বা সন্তানদের অবহিত করার বিপরীতে তাদেরকে অর্থ উপার্জন করে পরিবারের ব্যয় সংকুলানে অংশ নিতে বিভিন্ন রকম কাজের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য করে। শ্রম-শিশুরা যেহেতু তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত নয়, ফলে তারা সহজেই সঙ্গবদ্ধ দুষ্টচক্রের খপ্পরে পরে এবং তাদের দ্বারা শোষিত হয়। দুষ্টচক্র সুকৌশলে দরিদ্র এলাকাতে নিজস্ব অঞ্চলের বাইরে শিশুদের ও তাদের অভিভাবকদের অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন রকমের লোভনীয় চাকরীর প্রস্তাব দেয়। এই ধরণের প্রস্তাবে দরিদ্র পরিবারের নারী, শিশু ও বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিশুরা প্রভাবিত হয়ে পরে; ফলে তারা বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও পাচারের মত জঘন্য ঘটনার শিকার হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুদের পিতামাতারা চাকরীতে যোগদানের জন্য অগ্রীম অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে তাদের সন্তানদের জোরপূর্বক চাকরীর প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সেই সব পিতামাতারা যদি শিশু অধিকার সম্পর্কে জেনেও থাকে এক্ষেত্রে তাদেরকে উদাসীন আচরণ করতে দেখা যায়। যেহেতু বিভিন্ন ছোট বড় শহরগুলোতে অত্যধিক পথ-শিশু দেখা যায়, ফলে সেই সব পথ-শিশুদের প্রতিও সঙ্গবদ্ধ দুষ্টচক্রের নজর থাকে। তারা এই সব পথ-শিশুদেরও পাচার করার জন্য বিভিন্ন রকম কৌশল তৈরী করে। বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস (বিআইডিএস)-এর এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, নগরাঞ্চলগুলোতে আনুমানিক পথ-শিশুর সংখ্যা প্রায় তিন (৩) লক্ষ

৮০ হাজার, যার প্রায় ৫৫% রাজধানী ঢাকা শহরের পথে-ঘাটে চলাফেরা করে।[১৯] অন্যদিকে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ও আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান 'কনসরটিয়াম ফর স্ট্রীট চিলড্রন' এর পৃথক পৃথক গবেষণায় দেখা গেছে যে বাংলাদেশে আনুমানিক চার (৪) লক্ষ পথ-শিশু রয়েছে।[২০] দুই ধরনের তথ্য-উপাত্তে পার্থক্য সহনীয় মাত্রায় রয়েছে।

সমস্যা: সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা

বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এনজিওরা বিভিন্ন দাতাসংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় শিশু পাচারের মত জঘন্য কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এবং উদ্ধারকৃতদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। সামজিকভাবে মূলধারায় উদ্ধারকৃত শিশু ও নারীদের পুনর্বাসন করা এই কাজের সবচেয়ে বড় বাঁধা। বিশেষ করে নারী ও বয়ঃসন্ধিক্ষণের মেয়ে শিশুদের জন্য তা অনেক বিশাল সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়; তারা সমাজের জন্য নিষিদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়। সাধারনত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ও কমিউনিটির জন্য এটি একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয়। সামগ্রিক পরিস্থিতি আরো কঠিন হয়ে যায় যদি উদ্ধারকৃত মেয়েটি এইচআইভি বা সেক্সুয়্যালি ট্রেন্সমিটেড ইনফেকশন (এসটিআই) দ্বারা আক্রান্ত হয়।

উদ্ধারকৃত শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এদেশে অত্যন্ত অপ্রতুল। এই ক্ষেত্রে সরকারী সহায়তা ও বিদ্যমান পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোতে অর্থ বরাদ্দ খুবই নগন্য ও অপর্যাপ্ত। অন্যদিকে, দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের থেকে যৎসামান্য সাহায্যের উপর নির্ভর করে কিছু এনজিও উদ্ধারকৃত শিশুদের জন্য ছোট ছোট প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের কিছু কাজ করে যাচ্ছে। এনজিওরা অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অভাবে এই সকল কর্মকান্ড অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েই এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। এনজিওরা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনাকে আলাদাভাবে বিবেচনা করে উদ্ধারকৃত শিশুদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে এবং একইসাথে সামাজিকভাবে তাদেরকে পুনর্বাসন করা এবং বিকল্প পদ্ধতিতে তাদের জন্য শিক্ষা ও উপার্জনের ব্যবস্থা করছে। এই ধরণের সহায়তা প্রদানের প্রধান কারণ হচ্ছে সেইসব শিশু ও নারীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে অবগত করা, অধিকার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এনজিওরা একই সাথে সেই সকল নারী ও শিশুদের বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্পের উপর মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যেন তারা কাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের জন্য কর্ম সংস্থান করতে পারে। এই সকল নারী ও শিশুরা প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে সামর্থ্য অনুযায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসা বা চাকরী করে। তবে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এনজিওদের পক্ষে সকলকে সর্বাত্মক সহায়তা দেয়া সম্ভব হয় না। সামগ্রিক

[19] Convention on the Rights of the Child : concluding observations : Bangladesh, 26 June 2009, CRC/C/BGD/CO/4, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a8e977d0.html

[20] US State Department (2005), quoting a 2002 report by Government news agency Bangladesh Shongbad Shongsta [online], available at http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41738.htm [accessed 4 August 2009], cited in Thomas de Benitez, S. (2007), State of the World's Street Children: Violence, p. 9.

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ ও পর্যাপ্ত সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসছে না। এইরূপ পরিস্থিতির প্রধান কারণ অবশ্যই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠমোগত ত্রুটি।

উদ্ধার ও পুনর্বাসনের দূবলর্তাসমূহ

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ যেমনঃ বর্ডার গার্ড, পুলিশ, র‍্যাব ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে শিশু ও নারী পাচার ও উদ্ধার করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা এবং একইসাথে সঙ্গবদ্ধ দুষ্টচক্রকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন গবেষণা ও প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এই সকল আইন প্রয়োগকারী ও রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উল্লেখিত বিষয়ে বিশেষ ধরণের কোন রকম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই বা এই ধরনের উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নেই। ফলে তারা কিভাবে সঙ্গবদ্ধ দুষ্টচক্রকে চিহ্নিত, অনুসরণ ও জব্দ করবে, এবং নারী ও শিশুদের উদ্ধার করবে, সে সম্পর্কে কার্যকর কোন রকম কৌশল অনুসরণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী ও রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর ভীষণভাবে দক্ষতার অভাব রয়েছে। নারী ও শিশু পাচারের ক্ষেত্রে সঙ্গবদ্ধ দুষ্টচক্রের উচ্চমহলে শক্তিশালী প্রভাব থাকে যা তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে একটি বিশাল বাঁধা এবং গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার মত একটি বিষয়। অনেক সময় উচ্চমহলের রাজনৈতিক প্রভাবের জন্য আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। আবার অন্য দিকে আইন প্রয়োগকারী ও রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব কার্যক্রমের অস্বচ্ছতা ও জনগণের কাছে তাদের কর্মকান্ডের দায়বদ্ধতার অভাব, মানে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন না থাকার কারণেও সঙ্গবদ্ধ দুষ্টচক্র সুবিধা নিয়ে থাকে।

সামগ্রিকভাবে, উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিরাজমান অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশী ঘাটতি রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে অত্যন্ড় অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দের ফলে উদ্ধারকৃতদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা তৈরী করে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখানো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। বর্তমানে পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংখ্যা খুবই নগণ্য। উপরন্তু, এই সব কেন্দ্রে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুদের জন্য পৃথকভাবে সহায়তা প্রদানের কোন রকম অবকাঠামো বা ব্যবস্থা নেই। ফলে নির্দিষ্ট করে শিশুদের নিয়ে কাজ করার সুযোগ খুবই কম।

উন্নয়ন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা ও বিভিন্ন দাতাসংস্থাসমূহ এক্ষেত্রে সরকার ও এনজিও উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলো হচ্ছে ইউনিসেফ, আইএলও, সেভ দ্য চিলড্রেন ইত্যাদি। তবে সত্যিকার অর্থে সামগ্রিক সমস্যাটিকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও উন্নতি নিশ্চিত করতে যেভাবে অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন তা অনুসরণ করা যাচ্ছে না।

এই ধরনের শিশু পাচারকারী দুষ্টচক্রদের চিহ্নিত করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করতে, পাচার সংক্রান্ত ঘটনাসমূহ সংগঠিত হওয়ার মাত্রাকে সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে আসতে এবং একইসাথে জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখার জন্য এদেশে আইন প্রয়োগকারী ও রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোন বিশেষ ফোর্স বা বাহিনী নেই; এটি একটি বড় সমস্যা হিসাবে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া আইন প্রয়োগকারী ও রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি তাদের কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জনগণের কাছে জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো, তাহলে সাধারন জনগণ তাদেরকে বিভিন্ন রকম তথ্য দেয়াসহ সম্ভাব্য সকলভাবে সহায়তা করতো। কিন্তু, বাস্তবে সেইরূপ অবস্থা নেই। প্রাতিষ্ঠানিক দূর্বলতার কারণে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে যা বিভিন্ন ধরনের দূর্নীতিকে উৎসাহিত করছে। ফলে এক ধরনের স্বার্থান্বেষী মহল এই সকল আইন প্রয়োগকারী ও রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে নিরবচ্ছিন্ন সুবিধা নিয়ে যাচ্ছে; এমন কি আইন প্রয়োগকারী ও রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্যেও অপব্যবহারে তাদেরকে উৎসাহিত করছে।

আরো একটি বড় সমস্যা হলো সাধারন জনগণের অসহযোগিতার মানসিকতা। সাধারণ জনগণ আইন প্রয়োগকারী ও রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বিভিন্ন রকম তথ্য প্রদান করতে ভয় পায় বা অনিরাপদ মনে করে। এটি নারী ও শিশু পাচার সংক্রান্ত বিষয়ে এলাকার লোকজনের কাছ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করে। এইরূপ অবস্থার পরিবর্তন আনতে বা জনগণের মাঝে অনাস্থার মনোভাব দূর করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন আশা করা যাবে না। এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণ ও আইন প্রয়োগকারী ও রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া অত্যন্ত জরুরী। কাজেই যারা অপরাধ চক্রের সাথে জড়িত তাদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য প্রাপ্তির পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

সামাজিকভাবে সকল জনগনের সচেতনতার অভাবেও সঙ্গবদ্ধ দুষ্টচক্রের হাত থেকে শিশুদের নিরাপদ দূরত্বে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট সরকারী, বেসরকারী, এনজিওসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর এক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষা কভারেজ

ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার দেশের সর্বস্তরে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ধাপ হিসাবে ধরা হয়। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে এবং একই সাথে ১৯৯২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যদিকে 'শিক্ষা নীতি ২০১০' -এ প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক (মৌলিক) শিক্ষা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রাথমিক সেকেন্ডারী বিদ্যালয়কে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দারিদ্রতা একটি বিশাল বাঁধা। এটি জাতীয় কভারেজেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এখনও সাক্ষরতার হার বিবেচনায় বাংলাদেশ অনেক নিচের দিকের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রয়েছে। এক জরীপে জানা গেছে যে, এদেশে সাত (৭) বছরের উপরে সাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন মোট জনগণের সংখ্যা ছয় কোটি ৪০ লক্ষ। এদেশে শিশু-শ্রম একটি বড় সমস্যা যার প্রতিফলন শিক্ষা ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এখানে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রায় ৫০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী শিশু-শ্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠার আগেই ঝরে পরে। এক জরীপের ফলাফল অনুযায়ী দেশে মোট শ্রম-শিশুর সংখ্যা প্রায় ৭৯ লক্ষ যাদের বয়স পাঁচ (৫) থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। প্রায় ১৩ লক্ষ শিশু গড়ে আনুমানিক সপ্তাহে ৪৩ ঘন্টা বা তার অধিক সময় ধরে কাজ করে।[২১]

টেবিল ৫.০: প্রাথমিক শিক্ষার অর্জন

লক্ষ্য ২: বিশ্বব্যাপি অর্জন: প্রাথমিক শিক্ষা

লক্ষ্য, টার্গেট ও সূচকসমূহ	ভিত্তি বছর ১৯৯০/৯১	বর্তমান অবস্থা ২০১০	টার্গেট ২০১৫	অগ্রগতির অবস্থা
টার্গেট ২.এ: নিশ্চিত করবে, ২০১৫ সালের মধ্যে, সব জায়গার শিশু, ছেলে ও মেয়ে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ পর্বটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।				
২.১: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালিকাভূক্তদের শতকরা হার, %	৬০.৫	৯৪.৯	১০০	সঠিক পথে রয়েছে
২.২: ছাত্রছাত্রীদের অনুপাত যারা ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে, %	৪৩.০	৬৭.২	১০০	মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন

উৎস: মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গলস্, ইউএনডিপি

[21] ILO 2009 www.ilo.org

১৮ বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা হচ্ছে শিশু শ্রম। ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে, প্রায় ৩৬ লক্ষ শিশু বিভিন্ন রকম অর্থ উপার্জনকারী কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে যাদের বয়স ৭-১৪ বছর। তাদের মধ্যে ২১ লক্ষ শিশু একইসাথে পড়াশুনা চালিয়ে গেছে। তবে বিদ্যালয় ত্যাগের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সামগ্রিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে নেতিবাচত দিকে ধাবিত হয়েছে, কারণ শিশুদের পিতামাতারা তাদেরকে অর্থ উপার্জনের জন্য শিশু-শ্রমে বাধ্য করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি এক ধরনের বাস্তবতা। এদেশকে বলা যায়, শিশুরা তুলনামূলকভাবে নগর ভিত্তিক ব্যাপকতা, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ভৌগলিক অসাম্যতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে অতিমাত্রায় শিশু শ্রমে যুক্ত হচ্ছে। অবশ্য গ্রামাঞ্চলেও শিশু শ্রম রয়েছে। কাজেই শিশুদের শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের স্বপ্ন কখনই পূরণ হবে না, যদি না শিশু শ্রম থেকে শিশুদের সম্পূর্ণভাবে বিরত রাখা যায়। সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি শক্ত বাঁধা। পড়াশুনা করে কতদূর পর্যন্ত শিশুরা যেতে পারবে এবং তাদের জন্য কি ধরনের উন্নততর জীবন অপেক্ষা করছে -এ সম্পর্কে ভবিষ্যতের সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য না থাকায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে পিতামাতারও যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্থ, ফলে তারাও শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য খুব একটা আগ্রহ দেখায় না। উপরন্তু, পিতামাতারা তাদের শিশুদের অর্থ উপার্জনের জন্য নানা রকম কর্মকান্ডে শিশুদের প্রেরণ করছে; এক্ষেত্রে তাদের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে শিশুদের কাজে পাঠালে মাস শেষে কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকবে। অন্যদিকে অনেক ধরনের ব্যবসার মালিকরা কম অর্থ ব্যয় করার জন্য বিভিন্ন কাজে শিশুদের শ্রম ক্রয় করে। কাজেই একটি বিষয় স্পষ্ট যে, এদেশে শিশু শ্রমের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এটি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে শিশুদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শিক্ষা সম্পর্কিত শ্রম-শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গী

সাধারণভাবে জানা যায় যে, শিশুরা বিদ্যালয়ে যেয়ে পড়াশুনা করার বিষয়ে খুবই আগ্রহী এবং তারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে খুবই উৎসাহী। কিন্তু দেখা যায় তাদের পিতামাতা এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। পড়াশুনা করে তাদের সন্তানরা কতদূর যেতে সক্ষম হবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা না থাকায় পিতামাতারা তাদের সন্তানদের খুব একটা সহায়তা করতে চায় না। সন্তানরা পড়াশুনা করে তাদের জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারবে বলে পিতামাতারা মনে করে না। তাদের সনাতনী চিন্তাধারা অনুযায়ী দরিদ্র সন্তানরা পড়াশুনা করলেও দরিদ্রই থেকে যাবে। গৃহ পরিচারিকা হিসাবে কর্মরত শিশুরা আরো উল্লেখ করে যে, তাদের জীবনে বিনোদন বলতে কিছু নেই। এই সকল তথ্য সরাসরি গৃহে কাজ করা শিশুদের কাজ থেকে সংগ্রহ করা গেছে। বাংলাদেশের বন্দর নগরী চট্টগ্রামে কর্মরত শিশুদের নিয়ে একটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে এ সকল অনুভূতি শিশুরা সরাসরি প্রকাশ করে।

শিশুদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি

ভূমিকা

বাংলাদেশে শিশুদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ক্রমাগতভাবে উন্নতি হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে শিশুদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার সহশ্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসজিডি) অর্জনের জন্য নিজস্ব লক্ষ্য স্থির করেছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সুনির্দিষ্টভাবে, সহশ্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ অনুযায়ী, বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার কমানোর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সহশ্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সঠিক ধারায় বাংলাদেশ রয়েছে। এমডিজি ৪ -এ উল্লেখিত তিনটি নির্দেশনাতেই বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে এবং এইধারা অব্যহত রাখা সম্ভব হলে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তার কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে সামর্থ্য হবে।

বাংলাদেশে শিশুদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিটি মানুষের গড় আয়ু ৬৯.৭৫ বছর (আদমশুমারী ২০১১)। এই গড় আয়ু ১৯৭০ সালে ছিল মাত্র ৪৪ বছর যা ২০১০ সাল বেড়ে ৬৬ বছর হয়। অপরদিকে পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে; এই শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১২৬ জন থেকে কমে বর্তমানে ৪৮ জন হয়েছে। আর সব ধরণের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫০.৭৩।

চিত্র ০.২: পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার, ১৯৯৩-২০১০, বাংলাদেশ (প্রতি হাজারে)

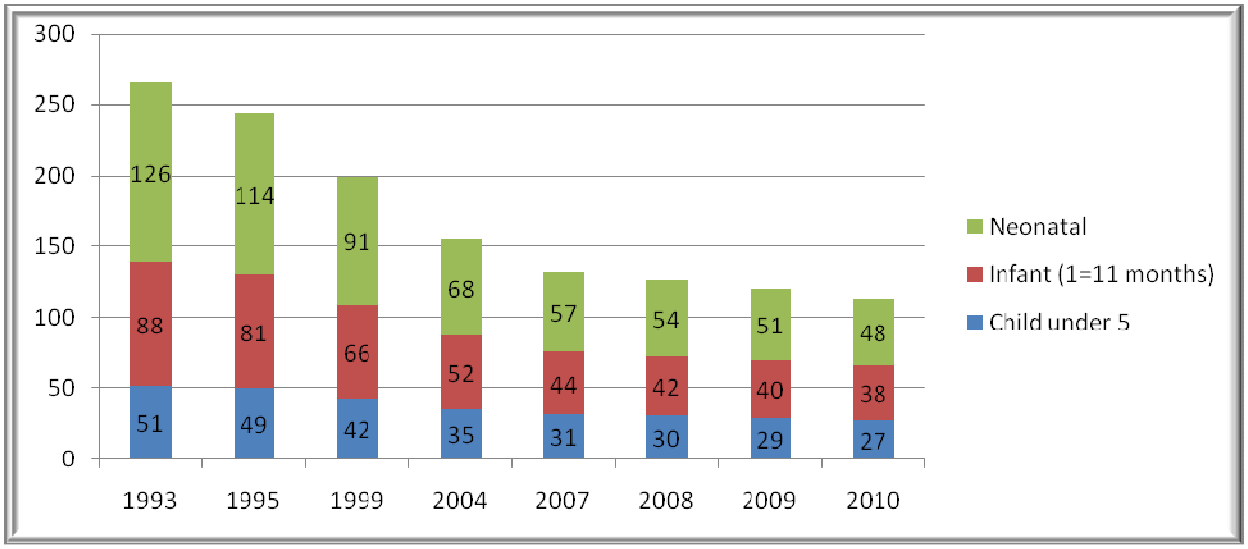

Source: Ministry of Health and Family Welfare, Bangladesh statistics, http://dmis-bd.homelinux.net/dmis/index.php?option=com_content&view=article&id=70&itemid=117

সাধারণভাবে বলা যায় বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। বাংলাদেশ সরকার গর্ভবতী মা ও শিশুদের জন্য তাদের দোরগড়ায় সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে সকলের জন্য (দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী হতদরিদ্রসহ) মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে 'ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি)' স্থাপন করেছে। নারী ও শিশুরা একেবারে তাদের এলাকায় বসে বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের প্রতিটি ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র' ইতোমধ্যে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে এবং সাধারণ জনগণ এই কেন্দ্র থেকে সব রকম স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারছে। তাছাড়াও প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে নারী ও শিশুদের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে যেখানে সকল নাগরিকগণ মানসম্পন্ন ডাক্তারদের অধীনে উন্নত মানের স্বাস্থ্যসেবা নিতে সক্ষম হচ্ছে। সরকারের এই সকল কার্যকর উদ্যোগ বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উলেণ্টখযোগ্য উন্নতি সাধনে প্রভাব ফেলেছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি বা অর্জন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদাহরণ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণসমূহ হলো ম্যালেরিয়া, নিমোনিয়া, ডায়রিয়া ও পুষ্টিহীনতা। যাদের বয়স পাঁচ বছরের নীচে সেই সব শিশুদের রক্ষা করতে বাংলাদেশ সরকার এই সকল রোগসমূহের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ফলে সামগ্রিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। সর্বস্ড়রে সর্বাত্মকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি কার্যক্রম এবং সময়মত পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের জন্য সকল ধরনের প্রতিশোধক টিকা প্রদান কর্মসূচী শিশুদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি উন্নয়নের প্রধান কারণ। সময়মত সর্বস্তরে সকল শিশুদের জন্য প্রতিশোধক টিকা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হওয়ায় এই সকল রোগের মাত্রা অনেক বেশী কমে গেছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১৯৮৫ সালে যেখানে মাত্র শতকরা এক শতাংশ শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রতিশোধক টিকা দেয়া সম্ভব হতো সেখানে ২০০০ সালের দিকে টিকা প্রদানের মাত্রা শতকরা ৮৮ ভাগ দাঁড়িয়ে ছিল। শিশুদের পুষ্টিহীনতার পরিস্থিতিরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের সময়মত শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির বিষয়টিও পজিটিভ ধারায় উন্নিত হয়েছে। এই শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির হার ২০০৭ সালে শতকরা ৫৭ ভাগ হয়েছিল যা ১৯৮৩ সালে ছিল শতকরা মাত্র ২৯ ভাগ।[২২]

শিশুদের বয়সের সাথে শারীরিক ওজনের সম্পর্ক রয়েছে। বয়সের তুলনায় কম ওজন থাকা শিশুদের একটি বিশাল সমস্যা, এটি সামগ্রিকভাবে শিশু বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলেই কম-বেশী এই সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্য মা ও শিশুরা সবসময় পর্যাপ্ত খাবার না পাওয়ায় এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরী হয়। তবে সময়ের সাথে সাথে অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বয়সের তুলনায়

[22] http://data.worldbank.org

ওজন কমের এই সমস্যার হার শতকরা ৩৭ ভাগ থেকে কমে ৩১ ভাগে দাঁড়িয়েছে। তবে বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রেও উলেণ্ঢখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। এই সমস্যার হার ১৯৯০ সালের শতকরা ৬৭ ভাগ থেকে কমে ২০০৮ সালে শতকরা ৪৩ ভাগ হয়েছে (ইউনিসেফ, ২০০৮)।

শিশুমৃত্যুর বিষয়টির সাথে সাথে মাতৃত্বকালীন মায়েদের মৃত্যুর বিষয়টিকেও যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন; যদিও সামগ্রিকভাবে শিশু ও মায়েদের মৃত্যুর হার ইতোমধ্যে অনেক কমে গেছে এবং সামগ্রিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। মাতৃত্বকালীন মায়েদের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৯৮৫ সালের জরীপ অনুযায়ী ছিল ৬৫০, যা ২০১০ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১৯৪। এটি সামগ্রিকভাবে দেশের সকল অঞ্চলের গড় চিত্র। দেশের সামগ্রিক গড় চিত্রের বাইরে মাতৃত্বকালীন মায়েদের মৃত্যুর হার সিলেট ও চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকাসমূহে অনেক বেশী। কাজেই ঐ সকল অঞ্চলসমূহের জন্য অনেক বেশী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশে মাতৃত্বকালীন মায়েদের মৃত্যুর অবস্থার আরো উলেণ্ঢখযোগ্য উন্নতি ঘটানোর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। কারণ এখনও প্রতি বছর আনুমানিক ১২,০০০ জন নারী গর্ভকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করে।

টেবিল ৬.০: উন্নততর মাতৃ স্বাস্থ্য অবস্থা

এমডিএস লক্ষ্য ৫: উন্নততর মাতৃ স্বাস্থ্য অবস্থা				
লক্ষ্য, টার্গেট ও নির্দেশনাসমূহ	ভিত্তি বছর ১৯৯০/৯১	বর্তমান অবস্থা ২০১০	২০১৫ টার্গেট	অগ্রগতির পর্যায়
টার্গেট ৫.এ: তিন চতুর্থাংশ কমাতে হবে, ১৯৯০ থেকে ২০১৫-এর মধ্যে, মাতৃত্বকালীন মায়েদের মৃত্যুর হার				
৫.১ মাতৃত্বকালীন মায়েদের মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০,০০০ বেঁচে যাওয়া শিশুর বিপরীতে)	৫৭৪	১৯৪	১৪৩	সঠিক পথে রয়েছে
৫.২ দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা শিশু জন্মের ব্যবস্থা, %	৫.০	২৬.৫	৫০	নজর দেয়া প্রয়োজন
টার্গেট ৫.বি: ২০১২ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে, সকলের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা				
৫.৪ বয়:সন্ধিক্ষণের জন্ম হার (প্রতি ১,০০০ মেয়ে)	৭৭	১০৫	-	নজর দেয়া প্রয়োজন

উৎস: মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গলস্, ইউএনডিপি

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ফলাফলে উলেণ্ঢখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে মাতৃত্বকালীন মায়েদের মৃত্যুর পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হলেও এখনও পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার আলোকে এখনও যে হারে মাতৃত্বকালীন মায়েদের মৃত্যু হচ্ছে তা একবারেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং একইসাথে অনভিপ্রেত। বাংলাদেশে এখনও কোন রকম স্বীকৃত

মেডিক্যাল সহযোগিদের সহায়তা ছাড়া গর্ভবতী মায়েদের বাড়ীতে অধিকাংশ শিশুর জন্ম হয়।[২৩] এক্ষেত্রে সরকারীভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় বা অস্বীকৃত স্থানীয় ধাত্রীরা এই কাজ করে থাকে, ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেক বেশী থাকে। কাজেই নিরাপদ গর্ভপাত, মায়ের শারীরিক সুস্থতা ও সুস্থ শিশুর জন্মগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারকে আরো অনেক বেশী কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

[23] Unicef Country profile 2009